অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

ডাকাতের ভাইপো

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. কাশীবাবু সকালে তাঁর বাগানে 2

২. এত্তেলা পেয়ে বটেশ্বর আর বিশ্বেশ্বর..................... 13

৩. দ্বিজপদর ঘরে লোকের ভিড় 22

৪. গুঁফো গনশা বলিয়ে কইয়ে মানুষ....................... 30

৫. কাশীবাবু সামনের বাগানে.......................... 42

৬. ইদানীং কানাইদারোগা............................. 51

৭. সকালে ঘুম থেকে উঠে হাই তুলে 73

১. কাশীবাবু সকালে তাঁর বাগানে

কাশীবাবু সকালে তাঁর বাগানে গাছপালার পরিচর্যা করছেন। সঙ্গে তাঁর বহুকালের পুরনো মালি নরহরি। নরহরি শুধু মালিই নয়, সে বলতে গেলে অনেক কাজের কাজি। তবে সে ভারী ভিতু লোক, দুনিয়ার সব কিছুতেই তার ভয়। দিনেদুপুরে একটা গোলাপ ডালের ন্যাড়া মাথায় গোবরের টুপি পরাতে পরাতে হঠাৎ সে বলে উঠল, “হয়ে গেল! ওই এসে পড়েছে। আর উপায় নেই কর্তামশাই, সব চেঁচেপুছে নিয়ে যাবে।”

নরহরির আগড়মবাগড়মকে তেমন গুরুত্ব দেন না কাশীবাবু। কুমড়োর ভাঙা মাচাটায় বাঁধন দিতে দিতে বললেন, “কার কথা কইছিস? কে এল?”

“ওই যে দেখুন না!মুশকো চেহারা, বাঘের মতো গুল্লু গুলু চোখ, ঝাঁকড়া চুল, কোমরে নির্ঘাত ছোরাছুরি আছে।”

কাশীবাবু দেখলেন, ফটকের বাইরে একটা উটকো লোক দাঁড়িয়ে উঁকিঝুকি মারছে বটে, তবে নেহাত হাঘরে চেহারা। রোগামতো, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে একখানা চেক লুঙ্গি, গায়ে সবুজ রঙের একখানা কামিজ, কাঁধে লাল গামছা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল আছে বটে, কিন্তু চেহারা মোটেই ভয়ংকর নয়। অনেক সময় সাহায্যটাহায্য চাইতে দু’-একজন গাঁয়ে ঢুকে পড়ে, এ তাদেরই কেউ হবে হয়তো।

কাশীবাবু হাতটাত ঝেড়ে ফটকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ”কে হে বাপু তুমি? কাকে খুঁজছ?”

লোকটা একগাল হেসে বলল, “বাগানখানা বড় সরেস বানিয়েছেন মশাই। কী ফলন, গাছপালার কী তেজ, দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়!”

কাশীবাবু খুশি হয়ে বললেন, “তা আর হবে না। মেহনত বড় কম করতে হয় না। গাছপালার আদরযত্ন করি বলেই না তারা ফলন্ত ফুলন্ত হয়ে ওঠে।”

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, “বড় খাঁটি কথা মশাই। আদরযত্নটাই তো আসল কথা। আদরযত্ন না পেলে সব জিনিসই কেমন দরকচা মেরে যায়। এই আমার অবস্থাই দেখুন না। কত কী হতে পারতুম, কিন্তু হলুম একটা লবডঙ্কা। যত্নই হল না আমার।”

কাশীবাবু দয়ালু মানুষ। নরম গলায় বললেন, “আহা, যত্ন করার কেউ নেই বুঝি?”

“কে আর থাকবে বলুন! মা-মরা ছেলের জীবন বড় দুঃখের। মা মরে যাওয়ায় বাবা বিবাগী হয়ে গেলেন, জ্ঞাতিরা এসে সব বিষয় সম্পত্তি দখল করে নিল। সেই ছেলেবেলা থেকে সাতঘাটের জল খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।”

কাশীবাবুর চোখ ছলছল করতে লাগল। দুঃখের কথা তিনি মোটেই সইতে পারেন না। ধুতির খুঁটে চোখের কোণ মুছে ধরা গলায় বললেন, “আহা, সত্যিই তো তুমি বেশ দুঃখী লোক হে!”

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলে, “যে আজ্ঞে। আমাকে দুঃখের তুবড়িও বলতে পারেন। নিদেন ফুলঝুরি তো বটেই।”

উদ্বিগ্ন হয়ে কাশীবাবু বললেন, “তা হলে তোমার উপায় কী হবে বাপু?”

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, “আজ্ঞে, উপায় তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। খুড়োমশাইকে খুঁজে না পেলে উপায় হওয়ার জো নেই কিনা।”

নরহরি এতক্ষণ কথা কয়নি। এবার কাশীবাবুর পিছন থেকে সে খিচিয়ে উঠে বলল, “তা বাপু, গাঁয়ে খুড়ো-জ্যাঠার অভাব কী? মেলাই পাবে। যাও না, খুঁজে দ্যাখো গিয়ে।”

কাশীবাবু একবার নরহরির দিকে ভৎসনার চোখে চেয়ে ফের লোকটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, “তা বাপু, তোমার খুড়োমশাই কি এই গাঁয়েই থাকেন?”

লোকটা ঠোঁট উলটে বলল, “কে জানে মশাই। থাকতেই পারেন। বাপ বিবাগী হওয়ার সময় বলেছিলেন, ‘ওরে খাঁদু, তোর যে কী হবে কে জানে! যদি পারিস, তবে তোর খুড়োকে খুঁজে দেখিস। তাকে পেলে তোর একটা হিল্লে হবে।’ তা মশাই সেই থেকে খুড়োকে কিছু কম খুঁজলুম না।”

“পেলে না বুঝি?”

“একেবারে পাইনি তা বললে ভুল হবে। কখনও অর্ধেকটা, কখনও সিকিটা পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু গোটাগুটি খুড়োমশাইকে নাগালে পেলুম কই?”

“তাজ্জব কথা! খুড়োর আবার সিকি-আধুলিও হয় নাকি হে? তোমার খুড়োমশাইয়ের তো একটা ঠিকানা আছে নাকি?”

মাথা নেড়ে খাঁদু বলে, “তা তো আছেই। থাকবারই কথা। ঠিকানা না থাকার জো নেই। কিন্তু মুশকিল হল সেটা আমার বাবা আমাকে বলেননি। তাই তো গোরুখখাঁজা খুঁজতে হচ্ছে মশাই। মেহনত বড় কম যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এত মেহনতে ভগবানকে পাওয়া যায়, তো খুড়োমশাই কোন ছার!”

“ঠিকানা না থাকলেও নাম তো একটা আছে রে বাপু?”

একগাল হেসে খাঁদু বলল, “তা আর নেই! খুব আছে। দিব্যি নাম মশাই। রাখালহরি গড়াই। নবগ্রামে রাখাল গড়াইকে পেলুম বটে খুঁজে, কিন্তু তিনি কালীর দিব্যি কেটে বললেন যে, তিনি নিকষ্যি রাখাল। রাখালের সঙ্গে হরি নেই মোটেই। তারপর ধরুন, শীতলাপুরের হরিপদ গড়াই, তাঁকে পাকড়াও করতেই তিনি ভারী রেগে গিয়ে বললেন, ‘কেন হে বাপু, হরিপদ হয়ে কি আমি খারাপ আছি? আমাকে আবার একটা রাখাল গছাতে

চাইছ কেন, তোমার মতলবটা কী হে?' তারপর ধরুন, মদনপুরে খুড়োমশাইকে প্রায় পেয়েই গিয়েছিলুম। রাখালহরি গড়গড়ি। যতই বলি গড়গড়ি নয়, ওটা আসলে গড়াই, ততই তিনি গরগর করে গর্জাতে থাকেন। ঘণ্টা দুই যুঝেও তাঁকে কিছুতেই মানতে পারলুম না যে, তিনি গড়গড়ি- ও হতে পারেন এবং গড়াই কিছু খারাপ কথাও নয়।"

"তা হলে তো মুশকিল হল হে। তা তোমার খুড়োমশাই কি বেশ পয়সাওলা লোক?"

খাঁদু চোখ বড় বড় করে বলে, "তা তো বটেই। কুঠিবাড়ি লুট করে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন যে! তারপর ডাকাত হিসেবে তাঁর আরও নামডাক হয়।"

"ডাকাত!" বলে কাশীবাবু হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

"যে আজ্ঞে। তেমন চুনোপুটি ডাকাতও নন। তাঁর মাথার দাম এখন লাখ টাকা।"

"ওরে বাবা! শুনেই যে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে! তুমি তো সাংঘাতিক লোক হে। ডাকাতের ভাইপো!"

"আজ্ঞে, ওইটেই তো হয়েছে মুশকিল! ডাকাতের ভাইপো শুনে লোকে বড় ঘাবড়ে যায়। অনেকে সন্দেহ করে, ভয় পায়, ঘটিবাটি সামলে রাখে। অনেকে আবার পুলিশে খবর দেওয়ার উদ্যোগ করে। কী ফ্যাসাদ বলুন দিকি! আমি মশাই, নিতান্তই নিরীহ ধর্মভীরু লোক। খুড়োমশাই হাতে মাথা কাটেন বটে, কিন্তু আমার তো মশা মাছি মারতেও হাত সরে না!"

কাশীবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "তা হলে বাপু, তুমি বরং অন্য কারও ভাইপো হলেই ভাল করতে। এই ধরো উকিল-মোক্তার বা ডাক্তার। ডাকাতের ভাইপো হওয়াটা মোটেই ভাল কথা নয়।"

"আজ্ঞে, সে কথাও খুব ভাবি। আমার যা স্বভাব, তাতে ওরকম একজন ডাকসাইটে ডাকাতের ভাইপো হওয়াটা মোটেই ঠিক হয়নি। তিনি লাখো লাখো টাকা লুটছেন বটে,

কিন্তু আমি মরছি বিবেক দংশনের জ্বালায়। এই তো দেখুন না, দিনদুই আগে নারানপুর গাঁয়ের হাটখোলায় একছড়া সোনার হার কুড়িয়ে পেলুম। তা ভরিটাক ওজন তো হবেই। কিন্তু যেই হাতে নিয়েছি অমনই যেন বিছুটি পাতার জ্বালা। সে কী জ্বলুনি মশাই, কী বলব! তারপর সারা গাঁ তোলপাড় করে যার হার হারিয়েছিল সেই খুকিটিকে খুঁজে বের করে তার হাতে হারছড়া তুলে দিয়ে তবে নিষ্কৃতি।”

“তা হলে তো বাপু, তুমি বেশ দোটানার মধ্যেই পড়েছ। একদিকে ডাকাতখুড়ো, অন্যদিকে বিবেকবুড়ো?”

“যথার্থই বলেছেন মশাই। দু’দিকের টানাহ্যাঁচড়ায় বড্ড জেরবার হচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কী, বিবেক দংশন যেমন আছে তেমনই খিদের জ্বালাও তো আছে। বাইরে থেকে দেখলে ঠিক বুঝবেন না, আমার ভিতরে বিবেক আর খিদের কেমন সাংঘাতিক লড়াই চলছে। ওফ, সে যেন সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ। কখনও বিবেককে ধরে খিদে এমন আছাড় মারে যে, বিবেকের অক্কা পাওয়ার দশা। কখনও আবার বিবেক তেড়েফুঁড়ে উঠে খিদেকে এমন চেপে ধরে যে, খিদের তখন দম আটকে মরার অবস্থা। তা এই খিদে যখন মাঝে মাঝে চাগাড় দিয়ে ওঠে, তখন কখনও-সখনও চুরি-ডাকাতি করতে যে ইচ্ছে যায় না তা নয়। তখন যেন খুড়োমশাই আমার ঘাড়ে ভর করেন। এই তো গেল হপ্তায় গোলোকগঞ্জে দিনদুই উপপাসের পর দুর্বল শরীরে একটু ঘোরাঘুরি করছি, হঠাৎ দেখি, একটা বাড়ির বাগানের বেড়ার ধারে একটা পেঁপে গাছে একেবারে হাতের নাগালে

একখানা হলুদ বরণ পাকা পেঁপে ঝুলে আছে। যেই না দেখা, অমনিই আমার খিদে লাফিয়ে উঠে বিবেককে কনুইয়ের ধাক্কায় সরিয়ে পাঁইপাঁই করে ছুটল।”

কাশীবাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, “বটে! তারপর কী হল!”

“আজ্ঞে, খিদে প্রায় জিতেই গিয়েছিল আর কী! আর-একটু হলেই মহাপাপটা করেই ফেলছিলুম প্রায়। কিন্তু হাত বাড়িয়ে পেঁপেটা যখন সাপটে ধরেছি, তখনই ভিতর থেকে

বাঘের মতো বিবেক গর্জন করে উঠল, “খবরদার, খাঁদু! এখনও পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য উঠছে, এখনও গঙ্গায় জোয়ার-ভাঁটা খেলছে, এখনও গোরুর দুধে সর পড়ে, এখনও দধিমন্থন করলে মাখন ওঠে, এখনও পাটালি গুড় দিয়ে পায়েস হয়। তাই বলছি, এ-পাপ তোর ধর্মে সইবে না। বুঝলেন মশাই, কী বলব, বিবেকের সেই বাঘা গর্জনে শরীরে যেন ভূমিকম্প হতে লাগল। মনস্তাপে মনটা ভরে গেল। হাত সরিয়ে নিলুম, পেঁপেটা যেমন ঝুলছিল তেমনই ঝুলে রইল।”

কাশীবাবু একটা খাস ছেড়ে বললেন, “যাক বাবা! পেঁপেটার জন্য ভারী দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার।”

“যে আজ্ঞে, হওয়ারই কথা। তবে পেঁপে বাঁচলেও এই খাঁদু গড়াইয়ের যে মরার দশা হয়েছিল মশাই! বিবেকের মার খেয়ে খিদে হার মানল বটে, কিন্তু আমার পেটে এমন কুঁইকুই করে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিছুতেই বাগ মানে না। ধর্ম রাখতে গিয়ে প্রাণ যায় আর কী? আচ্ছা মশাই, এটা কলিযুগ বলেই কি ধর্মভীরু মানুষরাই শুধু কষ্ট পায়, আর পাপীতাপী, খুনে-গুন্ডারা দিব্যি হেসে-খেলে বেড়ায়?”

“তা বাপু, কথাটা মন্দ বলেনি। আমিও শুনেছি, কলিযুগে সব উলটো নিয়ম।”

“আজ্ঞে, তাই হবে। আচ্ছা মশাই, আপনি কি ‘সধবার দীর্ঘশ্বাস বা ডাকাতের দয়া’ যাত্রাপালা দেখেছেন?”

“না বাপু, যাত্রাটাত্রা আমি বড় একটা দেখি না।”

পিছন থেকে নরহরি বলে, “আমি দেখেছি, বড্ড ভাল পালা, চোখের জল রাখা যায় না।”

খাঁদু একগাল হেসে বলল, “তবেই বুঝুন, এ কলিযুগ না হয়ে যায় না।”

কাশীবাবু অবাক হয়ে বলেন, “কেন বাপু, যাত্রাপালার সঙ্গে কলিযুগের সম্পর্ক কী?”

“বুঝলেন না! ও দুটো পালাই আমার খুড়োমশাইকে নিয়ে লেখা। আর শুধু কি পালা? তাঁকে নিয়ে কত গান বাঁধা হয়েছে জানেন? শোনেননি? সেই যে, মিছেই করো দৌড়াদৌড়ি, হাতে নিয়ে দড়াদড়ি, পরাবে যে হাতকড়ি হে কোথায় পাবে হাত, বাপের ব্যাটা রাখালহরি, তারই দয়ায় বাঁচি মরি, তার হাঁকেডাকে দাপে খাপে সবাই কুপোকাত...হবে সবাই কুপোকাত। শোনেননি?”

“না হে বাপু।”

নরহরি বলল, “আমি শুনেছি।”

খাঁদু দেঁতো হাসি হেসে বলে, “তবেই বুঝুন, কলিযুগে পাপীতাপীরা কেমন তোফা আছে। খুনখারাপি, লুটমার করে দোহাত্তা কামাচ্ছে, তার উপর তাদের নিয়ে পালা হচ্ছে, গান বাঁধা হচ্ছে। এসব কি অশৈলী কাণ্ড নয় মশাই?”

“তা তো বটেই।”

“আর এই আমাকে দেখুন, গোবেচারা, ধর্মভীরু মানুষ। কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। খুন-জখম, চুরি-ডাকাতির ছায়াও মাড়াই না। তা কে দাম দিচ্ছে বলুন! সেই সাতসকালে বিষ্ণুপুর গ্রাম থেকে হাঁটা দিয়ে তিন মাইল ঠেঙিয়ে আসছি, খিদের চোটে পেট খোঁদল হয়ে আছে, তেষ্টায় বুক অবধি ঝামা, তবু কোনও ভালমানুষ কি একবারও ডেকে বলল, “ওরে বাপু খাঁদু, আয় বাবা, এই ঠান্ডার সকালটাতে এক পাত্তর গরম চা আর দু’খানা বাসি রুটি খেয়ে আত্মারামটা একটু ঠান্ডা কর বাবা। কিন্তু মশাই, আজ যদি আমার শ্রদ্ধাস্পদ খুড়োমশাই রাখালহরি গড়াই হাতে একখানা রাম-দা বাগিয়ে এসে দাঁড়াতেন, তা হলে দেখতেন, খাতির কাকে বলে! এতক্ষণে গরম গরম ফুলকো লুচি আর মোহনভোগ, সঙ্গে রসগোল্লা-পান্তুয়ার গাদি লেগে যেত। গাঁ ঝেঁটিয়ে পিলপিল করে লোক ধেয়ে আসত একবার চোখের দেখা দেখতে।”

কাশীবাবু তটস্থ হয়ে লজ্জিত মুখে বললেন, "আহা, তুমি চা-রুটি খেতে চাও, সেকথা আগে বলতে হয়! খিদে-তেষ্টা কার নেই বলো!"

পিছন থেকে নরহরি একটু গলাখাঁকারি দিয়ে চাপা স্বরে বলল, "কর্তা, খাল কেটে কুমির আনছেন কিন্তু। এ লোক মোটেই সুবিধের নয়। কেমন চোর-চোর চেহারা, দেখছেন না। তার উপর ডাকাতের ভাইপো ! ডাকাতের ভাইপোরা কিন্তু ভাল লোক হয় না।"

কাশীবাবু মুখ ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত গলায় বলেন, "তুই ক'টা ডাকাতের ভাইপো দেখেছিস?"

"কেন, আমাদের কেষ্টপুরের পটল দাস! আমার বুড়ি ঠাকুরমা সারা সকাল কত কষ্ট করে গোবর কুড়িয়ে এনে ঘুটে দিতেন, আর বেবাক খুঁটে চুরি করে নিয়ে যেত ওই পটলা। মুদির দোকানে বাকি ফেলে জন্মে শোধ দিত না। আর নরেনবাবুর পোষা বিড়ালটা একখানা মাছের কাঁটা চুরি করেছিল বলে কী ঠ্যাঙার বাড়িটাই না মারল। এই পটলা হল কালু ডাকাতের সাক্ষাৎ ভাগনে।"

"তবে! ভাইপো আর ভাগনে কি এক হল? তুই যে মুড়ি আর মিছরির এক দর করে ফেললি? কালিয়া আর কোপ্তা কি আর এক জিনিস রে বাপু! ব্যাটবল আর বটব্যালে কি তফাত নেই? কিন্তু তোকে বলে কী লাভ, তুই তো সেদিনও সিন্নি খেয়ে বললি, 'পায়েসটা বড় জম্পেশ হয়েছে!'ভাগনে আর ভাইপোর তফাত তুই কী বুঝবি?"

"আজ্ঞে, ভাগনে পছন্দ না হলে হাতের কাছে ভাইপোও মজুত রয়েছে। আমাদের গাঁয়ের গিরিধারীর কথাই ধরুন! গিরিধারী হচ্ছে। যেমন ষণ্ড, তেমনই গুন্ডা, তার অত্যাচারে কত লোক যে গাঁ ছেড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। একে ধাঁই করে ঘুসি মারছে, তাকে ঠাস করে চড় মারছে, রামহরি কবরেজের চুল ধরে এমন টান মারল যে, চুলের গোড়াসুদ্ধু উঠে আসার কথা। তা ভাগ্যিস রামহরি কবরেজ পরচুলো পরত, তাই পরচুলার উপর দিয়েই গেল। রামহরির যে টাক ছিল, তা কেউ জানত না। পরচুলা খসে যাওয়ায় জানাজানি হতে

রামহরিও লজ্জায় গাঁ ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেল। তা সেই গিরিধারী হল নবকেষ্ট চোরের সাক্ষাৎ ভাইপো।”

“চোর!” বলে নাক সিঁটকোলেন কাশীবাবু। তারপর বিরক্তির সঙ্গে বললেন, “তোর বড় ছোট নজর। কথা হচ্ছে ডাকাতের ভাইপো নিয়ে, তুই ফট করে চোরের ভাইপোকে এনে ফেললি। ওরে, আদার সঙ্গে কি কাঁচকলা মেলে! নাকি আমের দামে আমড়া বিকোয়!”

এই সময়ে হঠাৎ একটা বাজখাঁই গলা সবাইকে চমকে দিয়ে বলে উঠল, “অ্যাই! কী নিয়ে এত কথা হচ্ছে রে! গন্ডগোল কীসের?”

কাশীরামবাবুর বাবা নসিরামের চেহারাখানা দেখবার মতোই। ছ’ফুট লম্বা, বিশাল কাঁধ, মুগুরের মতো দুখানা হাত, প্রকাণ্ড তাগড়াই গোঁফ, মাথায় সিংহের কেশরের মতো কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুল। এখনও রোজ বৈঠক করেন, ডাম্বেল বারবেল করেন, মুগুর ভাঁজেন, প্রাতভ্রমণ সান্ধ্যভ্রমণ তো আছেই। এইমাত্র মাইল পাঁচেক প্রাতভ্রমণ করে ফিরলেন। গায়ে পুরোদস্তুর মিলিটারি পোশাক, পায়ে ভারী মিলিটারি বুট। একসময় যে মিলিটারিতে ছিলেন, সেটাই সবাইকে সব সময়ে সমঝে দেন আর কী?

কাশীবাবু তাঁর বাবাকে যমের মতো ভয় খান। এখনও চোখের দিকে চেয়ে কথা কন না। বাবার জেরার জবাবে মিনমিন করে বললেন, “না, এই ডাকাতের ভাইপো নিয়ে কথা হচ্ছিল।”

নসিরাম গর্জন করে উঠলেন, “ডাকাত! কোথায় ডাকাত?”

নরহরি তাড়াতাড়ি খাঁদুকে দেখিয়ে দিয়ে বলে উঠল, “আজ্ঞে, এই যে, ইনিই!”

“বটে! যা তো, দৌড়ে গিয়ে কোদালটা নিয়ে আয়।”

নরহরি অবাক হয়ে বলে, “কোদাল! কোদাল দিয়ে কী হবে কর্তাবাবা?”

বাঘা চোখে চেয়ে নসিরাম বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, "কোদাল দিয়ে বাগানের উত্তর-পূর্ব কোণে একটা তিন হাত লম্বা দেড় হাত চওড়া গর্ত খুঁড়ে ফ্যাল শিগগির। এই ডাকাতটাকে আজ জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।"

কাশীরাম তটস্থ হয়ে বললেন, "বাবামশাই, এই প্রাতঃকালেই খুনখারাপি কি ভাল দেখাবে?"

নসিরাম গর্জে উঠলেন, "কেন, প্রাতঃকালে ডাকাতকে জ্যান্ত পুঁতলে দোষ হচ্ছে কোথায়?"

"আজ্ঞে, এ ঠিক ডাকাত নয়। ডাকাতের ভাইপো!"

"ওই একই হল। যা, যা, তাড়াতাড়ি কোদাল এনে গর্তটা করে ফ্যাল তো নরহরি!"

খাঁদু গড়াই কিন্তু মোটেই ঘাবড়াল না। হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে মিঠে এবং মোলায়েম গলায় বলল, "পেন্নাম হই কর্তাবাবু। এই এতক্ষণ এঁদের সঙ্গে কথা কয়ে ঠিক সুবিধে হচ্ছিল না। এই

আপনার গলাটা শুনে পিলেটা এমন চমকাল যে, শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে। পুরুষ-সিংহ বলে কথা! দেশে পুরুষ-সিংহের বড়ই অনটন কর্তাবাবা। ওঃ, যেমন গামা পালোয়ানের মতো চেহারা আপনার, তেমনই রাজাগজার মতো ভাবভঙ্গি। দেখে বুকটা ভরে গেল। তা আপনি মারতে চাইলে মরেও সুখ। শিয়াল কুকুরের হাতে মরার চেয়ে বাঘ-সিংহের হাতে মরাই ভাল, কী বলেন? বুক ফুলিয়ে পাঁচজনকে বলা যায়।"

নসিরাম প্রশস্তি শুনে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, "তবে?"

খাঁদু গদগদ হয়ে বলে, "উচিত কথাই কইছি কর্তা। মরণকালে মিছে কথা কয়ে লাভ কী বলুন। পাপের বোঝা আরও ভারী হবে বই তো নয়। আমার খুড়ো রাখালহরি গড়াই ডাকাত বটে, কিন্তু আপনার কাছে নস্যি। আমাদের গাঁয়ের হরু পালোয়ান একসঙ্গে চার-চারজন

পালোয়ানকে চিত করত বটে, কিন্তু তাকে দেখলেও এমন ভক্তিছেদ্ধা হয় না, কিংবা হরগোবিন্দপুরের বিশ্বেশ্বরের কথাই যদি ওঠে, পাগলা হাতির শুঁড় ধরে টেনে জিলিপির মতো শুড়টাকে পাকিয়ে এমন কাণ্ড করেছিল যে, হাতির ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা! তা সেই হাতিবীর বিশ্বেশ্বরও আপনার ধারেকাছে আসতে পারে না। এই যে আপনার সামনে দাড়িয়ে আছি, মনে হচ্ছে, আসলে মানুষ তো নয়, যেন বরফ-মাখানো পাহাড়!"

নসিরাম সায় দিয়ে ঘনঘন মাথা নাড়লেন। তারপর ভ্রু কুঁচকে খাঁদুকে একটু দেখে নিয়ে বললেন, "এঃ, এই চেহারা নিয়ে ডাকাতি করিস? ছ্যাঃ ছ্যাঃ। তোর তো বুকের ছাতি তেত্রিশ ইঞ্চির বেশি নয়, অমন প্যাকাটির মতো সরু হাত দিয়ে সড়কি-তলোয়ার চালাবি কী করে? আর অমন মিহিন গলায় হা-রে-রে-রে বলে হাড় ছাড়লে যে শিয়ালের ডাকের মতো শোনাবে! সব জিনিসেরই একটা প্রশিক্ষণ আছে, বুঝলি!"

খাঁদু ভারী কাচুমাচু হয়ে বলে, "দুনিয়ায় কত কী শেখার আছে কর্তাবাবা, কিন্তু শেখায় কে বলুন! অমন রাখালহরির ভাইপো হয়ে আজ অবধি হাতেখড়িটাও হয়ে উঠল না। তেমন শিক্ষকই বা দেশে কোথায় বলুন?"

"তার আর ভাবনা কী? আমার কাছে থাক, দু'মাসে তৈরি করে দেব।"

খাদু তাড়াতাড়ি নসিরামের পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে আর মাথায় ঠেকাল, ধরা গলায় বলল, "আজ্ঞে, আজ যে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলুম!"

নরহরি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, "কর্তাবাবা, এই যে কোদাল এনেছি!"

নসিরাম ভারী অবাক হয়ে বললেন, "কোদাল! কোদাল দিয়ে কী হবে রে?"

"ডাকাতটাকে জ্যান্ত পুঁতকেন বলে গর্ত করতে বললেন যে!"

নসিরাম নাক কুঁচকে বললেন, "আরে দুর! এটাকে ডাকাত বললে ডাকাতের অপমান হয়। আগে এটাকে তাগড়াই একটা ডাকাত বানাই, তবে তো জ্যান্ত পুঁতবার কথা ওঠে।

এরকম একটা হাড়জিরজিরে সিড়িঙ্গে চেহারার ডাকাতকে পুঁতে কি জুত হয় রে? লোকে যে ছ্যা-দ্যা করবে, তুই বরং এর জন্য একগোছা রুটি আর একবাটি গরম ডালের ব্যবস্থা কর। দুপুরে মুরগির সুরুয়া, রাতে পাঁঠার মাংস। লাঠি-সড়কি-বল্লমগুলো বের করে ঘষেমেজে সাফ কর তো! আজ থেকেই এর ট্রেনিং শুরু।”

এই বলে খাঁদুর নড়া ধরে টেনে হনহন করে বাড়িতে ঢুকে গেলেন নসিরাম। বাক্যহারা হয়ে কাশীবাবু আর নরহরি হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

২. এত্তেলা পেয়ে বটেশ্বর আর বিশ্বেশ্বর

এত্তেলা পেয়ে বটেশ্বর আর বিশ্বেশ্বর হেলেদুলে এসে হাজির। দু’জনেরই বেশ মজবুত চেহারা। একটা কুস্তির আখড়া আছে, তাতে দশটা গাঁয়ের পঞ্চাশ-ষাটটা ছেলে কুস্তি শিখতে আসে। ডলাইমলাইতে বিশ্বেশ্বর আর বটেশ্বরের খুব নাম।

নসিরাম বললেন, “ওরে বিশু, ওরে বটু, দ্যাখ তো বাবা, এই টিঙটিঙে ডাকাতটাকে মানুষ করতে পারবি কিনা।”

ডাকাত শুনে একটু ভড়কে গিয়ে বটেশ্বর বলে উঠল, “ওরে বাবা! ডাকাত তো সর্বনেশে ব্যাপার কর্তা! বাঘা কুকুর পুষুন, দুষ্ট গোরু পুষুন, এমনকী বাঘ-সিংহ পুষুন, তাও ভাল। কিন্তু ডাকাত পোষাটা আপনার ঠিক হচ্ছে না।”

নসিরাম গম্ভীর হয়ে বললেন, “আহা, ওসব তো সবাই পোষে। ওতে মজা নেই। ডাকাত পোষা একটা নতুন ব্যাপার তো!”

বিশ্বেশ্বর নীরবে খাঁদু গড়াইকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, “কত দর পড়ল কর্তা? তা যাই দর দিয়ে থাকুন, বড় ঠকে গেছেন। এই অচল ডাকাত কে আপনাকে গছিয়ে গেল? এ ডাকাত এ পরগনায় চলবে না।”

নসিরাম অবাক হয়ে বলেন, "বলিস কী রে? এক্কেবারে অচল নাকি?"

"দরকচা মারা চেহারা দেখছেন না? এরকম পাকানো শরীরে কি মাংস লাগে? লাগলেও খরচা মেলা পড়ে যাবে। তারপর ধরুন, এ পরগনার সব ডাকাতই হল রীতিমতো পালোয়ান। প্রহ্লাদ ডাকাত এখনও বেঁচে। লোকে বলে, প্রহ্লাদ না জল্লাদ। ওই নামে একখানা পালাও বেঁধেছিল হরিহর নিয়োগী। সেই পালা বিষ্ণুপুরে সাত দিন ধরে ডবল শো হাউসফুল গিয়েছে। স্বয়ং প্রহ্লাদ সেই পালা দেখে হাপুস নয়নে কেঁদেছিল। আর শুধু প্রহ্লাদই বা কেন, মোটকা মল্লিক, টেকো টগরকুমার, গুঁফো গণেশ, হাড়ভাঙা হারাধন, লেঠেল ললিত, মারকুটে মহেশ, চাকু চপল, সড়কি সতীশ, বাঘা বগলা, কার পাশে একে দাড় করাবেন বলুন তো!"

নসিরাম একটু দমে গিয়ে বলেন, "না রে, যতটা ভাবছিস ততটা নয়। এলেম আছে। এই তো বারোখানা রুটি আর একবাটি ডাল সেঁটে দিল। সঙ্গে এক খাবলা বেগুনপোড়া। তার উপর গায়ে ডাকাতের রক্তও আছে তো! ওর খুড়ো নাকি মস্ত ডাকাত!"

বিশ্বেশ্বর অবাক হয়ে বলে, "নাকি? তা তোমার খুড়োর নাম কী হে?"

খাঁদু বিনয়ের সঙ্গেই বলল, "আজ্ঞে, রাখালহরি গড়াই।" বিশ্বেশ্বর একটু ভেবে মাথা নেড়ে বলল, "না, এ-পরগনার নয়।"

নসিবাবু একটু তোয়াজ করে বললেন, "একটু নেড়েচেড়ে দ্যাখ না বাবা। ডলাইমলাই করলেই দেখবি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠেছে। আমার তো দেখেই মনে হয়েছিল, এর ভিতরে ডাকাতির জীবাণু একেবারে বিজবিজ করছে।"

"আপনি যখন বলছেন কর্তা, তখন দেখাই যাক। ওহে বাপু, একটু উঠে দাড়াও তো!"

খাঁদু উঠবার আগেই দুই পালোয়ান দু'দিক থেকে এসে তার নড়া ধরে হ্যাঁচকা টানে খাড়া করে দিল। বটু বলল, "প্রথমটায় একটু হাল্কা কাজই দিচ্ছি। দুশো বৈঠক মারো তো বাপু!"

খাঁদুর চোখ কপালে উঠল, "দুশো! বলেন কী মশাই! ইসকুলে অবধি দশবারের বেশি ওঠবস করায় না! এই ভরা পেটে বেশি নড়াচড়া করলে বদহজম হবে যে! অম্বল হয়ে যাবে।"

বিশু নসিবাবুর দিকে চেয়ে বলে, "শুনলেন, কর্তা? ডাকাতের অম্বল হয় কখনও শুনেছেন?"

নসিবাবু হেঁকে বললেন, "ওরে, ঠিকই বৈঠক মারবে। একটু কোঁতকা-টোঁতকা দিয়ে দ্যাখ না? আড় ভাঙতেই যা সময় লাগে।"

বিশু পট করে খাঁদুর বাঁ পাঁজরে দু'আঙুলে একটা খোঁচা মারতেই খাঁদু বাপ রে' বলে লাফিয়ে উঠল।

বিশু মাথা নেড়ে বলল, "এ, এ যে একেবারে ভুসিমাল গছিয়ে গিয়েছে আপনাকে কর্তা! পাঁজরার হাড় তো প্যাকাটির মতো মুড়মুড় করছে।"

বটুও খুব চিন্তিত মুখে বলল, "দাবনায় তো মাংসই নেই কর্তা!"

নসিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "শোন বাপু, একটা গাট্টাগোট্টা চেহারার লোক পেলে তাকে তৈরি করা তো সোজা কাজ। তাতে কি মজা আছে কিছু? এই তালপাতার সেপাইকে যদি পালোয়ান না বানাতে পারলি তবে কীসের মুরোদ তোদের?"

বিশু লজ্জিত মুখে বলল, "তা কর্তা যখন বলছেন, মেহনত করলে অচল পয়সাও যখন চালানো যায়, তখন আমরাও চেষ্টা করে দেখব। আপনার একটু খরচাপাতি যাবে, এই যা!"

বটু খাঁদুর দিকে চেয়ে বলল, "কী হে বাপু, বৈঠক মারবে, নাকি ফের খোঁচাখুঁচি করতে হবে।"

খাদু পিটপিট করে দু'জনের দিকেই ভয়ে ভয়ে চাইল। তারপর বলল, "যে খোঁচা মেরেছেন মশাই, তাতেই তো শরীর ঝনঝন করছে। বৈঠক যে মারব, হাঁটুতে যে জোর পাচ্ছি না মোটে। তা জোরাজুরি যখন করছেন তখন অগত্যা মারতেই হয়।"

বলে খাদু টপাটপ বৈঠক মারতে শুরু করল। নসিবাবু কড় গুণে হিসেব রাখতে রাখতে মাঝে মাঝে তারিফ করে উঠতে লাগলেন, "বাহবা !... বহোত আচ্ছা!... চালিয়ে যা বাবা!... বাঃ বাঃ, এই তো দিব্যি হচ্ছে।"

তা হলও। বটু আর বিশুও হাঁ করে দেখল, খাদু গড়াই দিব্যি দুশোটা বৈঠক মেরে একটু হাঁদাতে হাদাতে বলল, "হল তো মশাই! এবার খ্যামা দিন।"

দুশো বৈঠক মারা যে চাট্টিখানি কথা নয়, তা বটু আর বিশু ভালই জানে। ছোঁড়া যে অত বৈঠক একবারে মেরে দেবে, তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি।

বিস্ময়টা চেপে রেখে বটু বলল, "মন্দ নয়। তবে এ তো অল্পের উপর দিয়ে গেল। এবার তোমার পাঞ্জার জোরটা যে একটু দেখাতে হচ্ছে বাপ। এই যে আমার ডান হাতের পাঁচ আঙুল ছড়িয়ে দিলুম, তুমিও তোমার পাঁচ আঙুল দিয়ে কষে ধরো। যে যার ডান দিকে মোচড় দিতে হবে। বুঝলে?"

নসিবাবু বিশুকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "ওরে, তুই একটু হিসেব করে মোচড় দিস। তোর তো হাত নয়, বাঘের থাবা, বেচারার কবজিটা আবার মট করে ভেঙে দিস না বাবা!"

"না, কর্তা! হিসেব করেই দিচ্ছি।"

কিন্তু বিশুর হিসেব একটু উলটে গেল। কারণ, খাদু গড়াইয়ের রোগাপানা হাতখানাকে যত দয়াদাক্ষিণ্য দেখানোর কথা, ততটা দেখায়নি বিশু। সে বেশ বাঘা হাতে চেপে ধরে পেল্লায় একটা মোচড় মেরেছে। কিন্তু এ কী! খাদু গড়াইয়ের দুবলা হাতখানা মমাটেই পাক খেয়ে গেল না। বরং তার সরু আঙুলগুলো লোহার আঁকশির মতো বেশ বাগিয়ে ধরে আছে বিশুর মোটা মোটা আঙুল। কবজি টসকাল না, বরং যেন একটু একটু করে ডান দিকে ঘুরে যেতে লাগল। মিনিটখানেক একভাবে থাকার পর আচমকাই একটা রাম মোচড়ে বিশুর হাতখানা উলটে দিল খাঁদু। বিশু বাপ রে' বলে হাতটা ঝাড়তে ঝাড়তে অ্যাই বড় বড় চোখ করে খাঁদুর দিকে চেয়ে রইল।

নসিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "শাবাশ!" কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্বাস্যই নয়। বটু বা বিশু কেউ বিশ্বাস করতেই পারছিল না যে, এই রোগাপটকা লোকটা বিশুকে গোহারান হারিয়ে দিয়েছে।

নসিবাবু বললেন, "বলি ব্যাপারটা কী হল বল তো? ইচ্ছে করে হেরে গেলি নাকি?"

বিশু গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "না, কর্তা, এর মধ্যে অন্য ব্যাপার আছে।"

"কী ব্যাপার ?"

"এ-লোকটা মন্তরতন্তর জানে। বোধহয় পিশাচসিদ্ধ।"

নসিবাবু হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বললেন, "দুর, দুর! মন্তরতন্তর সব কুসংস্কার। মন্তরে কাজ হলে আর লোকে এত কসরত করত না। বোমাবন্দুকও রাখত না। ওসব নয় রে। এই খাঁদু গড়াইয়ের ভিতরে খাঁদু ডাকাত ফুসছে। ও আমি দেখেই চিনেছিলাম। তোরাই কেবল তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিলি।"

অপমানটা বটুর ঠিক সহ্য হচ্ছিল না। সেও মন্তরতন্তরে বিশ্বাসী নয়, ডাকাবুকো লোক। সে হাতে হাত ঘষে দন্ত কিড়মিড় করে বলল, "কর্তা, যদি অনুমতি দেন আমি এ ব্যাটাকে একটু যাচাই করি।"

খাঁদু ককিয়ে উঠে বলল, "আর না, আর না। আমি হেরে গিয়েছি বলেই ধরে নিন না কেন।"

নসিবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ওরে, জীবনে কি পরীক্ষার শেষ আছে? সীতার অগ্নিপরীক্ষার পরও কি বনবাস হয়নি? হারার আগেই হেরে যাবি কেন? তোর রক্তে যে এক ডাকু ডাকহাঁক করছে, শুনতে পাস না আহাম্মক। যা, এটাকেও হারিয়ে দে।"

বটু বলল, "শোনো বাপু, এবার আর পাঞ্জার লড়াই নয়। আমরা দু'জনেই দু'জনকে চেপে ধরব। যে চেপে অন্যের দম বের করে দিতে পারবে তার জিত। বুঝলে?"

খাঁদু কঁদো কাঁদো হয়ে বলে, "বুঝেছি। আজ বুঝি আমার প্রাণরক্ষা হল না। অপঘাতে মরলে কী গতি হবে কে জানে!"

নসিবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ওরে, গতি নিয়ে ভাবিসনি। নিতান্তই যদি মরিস তবে তোর বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করব। দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাব। চাস তো গয়ায় গিয়ে পিণ্ডিও দিয়ে আসব। সে এমন শ্রাদ্ধ হবে যে, তার ঠেলায় একেবারে স্বর্গের সিংহদরজায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বি। দেখে নিস।"

খাঁদু ঘাড় নেড়ে বলল, "যে আজ্ঞে, তবে আর কথা কী? কিন্তু, দুঃখের কথা কী জানেন, শ্রাদ্ধের ভোজটা যে আমার ফঁক যাচ্ছে। লোকে যখন ভেঁড়েমুশে সাপটে ভোজ খাবে তখন যে আমার কপালে হাওয়া ছাড়া কিছুই জুটবে না।"

নসিবাবু মোলায়েম গলায় বলেন, "তা তুই চাস কী?"

“আজ্ঞে, বলছিলাম, ভোজের আগাম বাবদ যদি কিছু মূল্য ধরে দিতেন তা হলে বুকটা ঠান্ডা হত।”

“সে আর বেশি কথা কী? এই যে, পঞ্চাশটা টাকা রাখ। তুই যে এত ঘোড়েল তা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি।”

টাকাটা ট্যাঁকে খুঁজে খাঁদু একগাল হেসে বলল, “আজ্ঞে কর্তাবাবা, ট্যাঁকে টাকাপয়সা থাকলে মানুষের একটু জোর হয়। সত্যি কথা বলতে কী, এখন যেন হাত-পায়ে একটু সাড় ফিরেছে।”

বটু মাথা চুলকোতে চুলকোতে মিনমিন করে বলল, “কর্তা, একটা কথা...”

“তোর আবার কী কথা?”

“আজ্ঞে, বলছিলাম কী, আমাদেরও তো বাঁচা-মরা আছে, শ্রাদ্ধের

ব্যাপার আছে। আমাদেরও তো নিজের শ্রাদ্ধের ভোজ খেতে ইচ্ছে হতে পারে, নাকি? তাই বলছিলাম যে...”

নসিবাবু হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হুংকার দিয়ে বললেন, “তোর মতো জাম্বুবান যদি এই টিঙটিঙে তালপাতার সেপাইয়ের হাতে মরে, তা হলে এ-গাঁয়ে কেউ আর তোর মুখ দেখবে ভেবেছিস? শ্রাদ্ধ তো দুরের কথা, তোকে শ্মশানে নেওয়ারও লোক জুটবে না। নিজেকেই হেঁটে শ্মশানে গিয়ে নিজের মড়া নিজেকেই পোড়াতে হবে। বুঝেছিস?”

বটু মাথাটাথা চুলকে ঘাড় নেড়ে বলল, “বুঝেছি।”

“আরও ভাল করে বুঝে দ্যাখ। যদি প্রাণের ভয় থাকে তো মানে মানে বিদেয় হ। আমি গাঁয়ে রটিয়ে দেব যে, তুই একটা রোগা-দুবলা লোকের ভয়ে ন্যাজ দেখিয়েছিস। তা হলে কি গাঁয়ে তোর মান থাকবে, নাকি তোর কুস্তির আখড়ায় আর কেউ কোনওদিন যাবে?”

বটু একথায় ফুঁসে উঠে বলল, “এই ছারপোকাটাকে ভয়! হাঃ হাঃ! কর্তা কী যে বলেন! এক্ষুনি এর দম বের করে দিচ্ছি।”

বলেই তেড়ে এসে খাঁদুকে জাপটে ধরল বটু। ঠিক যেমন লৌহ-ভীম চূর্ণ করতে ধৃতরাষ্ট্র জাপটে ধরেছিলেন। খাঁদু সেই ভৈমী চাপে কোঁক করে উঠল। তারপর প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সেও সাপটে ধরল বটুকে। তারপর বিশালদেহী বটু খ্যাংরাকাঠির মতো খাঁদুকে পিষে ফেলতে লাগল আসুরিক হাতে। প্রথমটায় মনে হচ্ছিল বটে যে, এ বড় অন্যায্য লড়াই হচ্ছে। হেভিওয়েটের সঙ্গে মসকুইটোওয়েট। খাঁদুর হাড়-পাঁজর মড়মড় করে ভেঙে বুকের খাঁচাটাই যাবে গুঁড়িয়ে। ওই চাপে দম বেরিয়ে গেলেই শেষ। কিন্তু দেখা গেল, খাঁদু পেষাই হয়েও দমখানা ঠিক ধরে রেখেছে। মোটেই টসকাচ্ছে না।

মিনিটপাঁচেক গলদঘর্ম হওয়ার পর বটু যখন একটু দম নিয়ে ফের কষন দিতে যাচ্ছে, তখন খাঁদু একটা গা ঝাড়া দিয়ে টুক করে বটুর নাগাল থেকে বেরিয়ে এল।

বটু হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ কপালে তুলে বলল, “এ কার পাল্লায় পড়েছেন কর্তা? এ তো মনিষ্যিই নয়।”

“বলিস কী? দিব্যি দেখতে পাচ্ছি দুটো হাত, দুটো পা, ধড়ের উপর মুন্ডু, মানুষ বলেই তো মনে হচ্ছে।”

বটু মাথা নেড়ে বলে, “না কর্তা, যে কষন দিয়েছিলাম তাতে যে-কোনও পালোয়ানেরই দম বেরিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এ যেন পাঁকাল মাছ। কেমন পিছলে বেরিয়ে গেল দেখলেন না! মনিষ্যি হলে পারত?”

“মানুষ নয়! তা হলে কি ভূত?”

বটু ফের মাথা নাড়া দিয়ে বলে, “তা জানি না কর্তা। বরং একবার পালান ওঝাকে ডেকে একটু যাচাই করে নেবেন। পেন্নাম হই, আমরা তা হলে আসি..”

যেন বেশ একটু তাড়াহুড়ো করেই বটেশ্বর আর বিশ্বেশ্বর চলে গেল।

নসিবাবু আপন মনেই মাথা নেড়ে বললেন, "অপদার্থ! অপদার্থ। ডিসিপ্লিন নেই, ফিটনেস নেই, দিনরাত গোগ্রাসে খেয়ে খেয়ে চর্বির পাহাড় বানিয়েছে, আর বলে কিনা ভূত! ওরে ও খাঁদু, তোরও কি মনে হয় যে তুই ভূত?"

খাঁদু উবু হয়ে মাটিতে বসা। জুলজুল করে চেয়ে বলে, "আজ্ঞে, তাও হয় কর্তাবাবা! যখন বাঁচা-মরার তফাত করতে পারি না, তখন মাঝে মাঝে মনে হয়, মরেই গিয়েছি বুঝি! হাত-পা-দেহ সব যেন বায়ুভূত বলে টের পাই। তখন নিজেকে ভারী ভয়ও হয় আমার।"

"বটে!"

"যে আজ্ঞে! এই যে একটু আগে যখন গরম ডাল আর বেগুনপোড়া দিয়ে রুটি সাঁদ করছি, তখন দিব্যি মানুষ-মানুষ লাগছিল নিজেকে। যেন দিব্যি বেঁচেবর্তে আছি। কিন্তু যখন দানাপানি না জোটে, আর মাইলের পর মাইল ঠ্যাঙাতে হয়, তখনই বোধ হয় একটু একটু ভূত-ভূত ভাবও আসে। তা কর্তাবাবা, এখান থেকে নীলপুরের জঙ্গলটা কদুর হবে?"

ভ্রু কুঁচকে নসিবাবু বলেন, "নীলপুরের জঙ্গল? সে মোটেই ভাল জায়গা নয়। ও জঙ্গলের খুব বদনাম। কেন, নীলপুরের জঙ্গল দিয়ে তোর কী কাজ?"

"আজ্ঞে, একটা পাকা খবর আছে। আমার খুড়োমশাই সেখানেই হালে থানা গেড়েছেন। বয়স হয়েছে, ইদানীং নাকি 'খাঁদু, খদু' বলে কান্নাকাটি করেন খুব। কাদারই কথা! তার তো আর আমি ছাড়া তিন কুলে কেউ নেই। লাখো লাখো টাকাপয়সা, গয়নাগাটি বস্তাবন্দি হয়ে পড়ে আছে। সেগুলোর কী গতি হবে বলুন!"

নসিবাবু ভারী চিন্তিত হয়ে বললেন, “হুম! বড্ড মুশকিলে ফেললি। বেশি টাকাপয়সা হাতে পেলে লোকে কুঁড়ে হয়ে যায়, কাজেকর্মে মন দেয় না। আমি যে তোকে একটা চৌকস ডাকাত বানাতে চেয়েছিলুম, যাতে পরগনার সবক'টা ডাকাত ঢিট থাকে।”

৩. দ্বিজপদর ঘরে লোকের ভিড়

রোজ সকাল থেকেই দ্বিজপদর ঘরে লোকের ভিড়। সে একাধারে এই গাঁয়ের ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট, ডাক্তার, দার্শনিক, ভবিষ্যদ্বক্তা, ডিটেকটিভ এবং পরামর্শদাতা। সে ম্যাজিক জানে, কুংফু ক্যারাটে জানে, লাঠি বা তরোয়ালও চালাতে পারে বলে শোনা যায়। একটা লোকের মধ্যে এত গুণ থাকায় গাঁয়ের লোকের বড্ড সুবিধে হয়েছে। আজ সকালেই গোবিন্দবাবু তাঁর অচল ঘড়ি, সরলবাবু তাঁর ট্রানজিস্টর রেডিয়ো, ফুচুবাবুর মেয়ে শিউলি তার মুন্ডু-খসা ডলপুতুল, রমেশবাবু তাঁর চশমার ভাঙা ডাঁটি আর ধীরেনবাবু তাঁর টেপ রেকর্ডার সারিয়ে নিয়ে গেলেন। এখন হারাধন তার হারানো গোরুর সন্ধান, গোবর্ধনবাবু তাঁর পুরনো আমাশার ওষুধ, বিপুলবাবু তাঁর মেয়ের কোষ্ঠীবিচার, নব আর শ্রীপতি তাদের পুরনো ঝগড়ার মীমাংসার জন্য বসে আছে।।

দ্বিজপদর বয়স বেশি নয়। সাতাশ-আঠাশের মধ্যেই। ইতিমধ্যেই আশপাশের দশ বারোটা গাঁয়ে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় দিনদিন তার খদ্দের বাড়ছে। সকালের দিকটায় তার দম ফেলার সময় থাকে না। তার অ্যাসিস্ট্যান্ট হরিমাধব কড়া ধাতের ছেলে। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সে বারান্দায় চেয়ারে বসিয়ে রাখে, একে-একে ঢুকতে দেয়। তবে ভি আই পি হলে অন্য কথা।

এই যেমন কাশীবাবু। তাঁরা এই গাঁয়ের তিন নম্বর ভি আই পি। নবদ্বীপ সরকার আর কুলদাকান্ত রায়ের ঠিক পরেই। হওয়ারই কথা। কাশীবাবুর দাদু শশীবাবু রিটায়ার্ড দারোগা, বাবা নসিবাবু প্রাক্তন মিলিটারি। কাশীবাবু তেমন কিছু হতে না পারলেও

ওকালতি পাশ। তাই কাশীবাবুকে আটকাল না হরিমাধব। বরং সেঁতো হাসি হেসে বলল, "ভাল তো কাকু?"

গম্ভীর একটা হুঁ' দিয়ে কাশীবাবু ঘরে ঢুকে পড়লেন। "ওহে দ্বিজপদ, একটা বড় মুশকিলে পড়া গিয়েছে।" দ্বিজপদ খুব মন দিয়ে নবগ্রামের খগেন তপাদারের বাপকেলে গাদা বন্দুকটার ঘোড়া সারাচ্ছিল, মুখ না তুলেই বলল, "খাঁদু গড়াই তো?"

কাশীবাবু অবাক হয়ে বললেন, "তুমি কী করে জানলে?"

"সে আর শক্ত কী? একটু আগেই বটু আর বিশু এসেছিল, তারাই বলে গেল। বিশুর বিশ্বাস খাঁদু গড়াই পিশাচসিদ্ধ, বটুর ধারণা ভূত।"

"তা ওরকমই কিছু হবে বোধহয়। বাবামশাইকে তো প্রায় হিপনোটাইজ করে ফেলেছে। সবচেয়ে বড় কথা, সে একজন ভয়ংকর ডাকাতের ভাইপো।"

"যান, হয়ে গিয়েছে।" বলে বন্দুকটা খগেন তপাদারের হাতে দিয়ে তাকে বিদেয় করে একটা ন্যাকড়ায় হাতের কালি মুছতে মুছতে দ্বিজপদ বলল, "সেও শুনেছি। রাখালহরি গড়াই।"

"হ্যাঁ। সে নাকি মস্ত ডাকাত।"

দ্বিজপদ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "খুব ভুল শোনেননি কাশীদা। রাখালহরি এই তল্লাটের লোক নয়, সম্প্রতি নীলপুরের জঙ্গলে এসে থানা গেড়েছে। সে এমনই ভয়ংকর যে, কানাইদারোগার অবধি ঘুম ছুটে গেছে। পরশুদিন দারোগাবাবু এসে দুঃখ করে গেলেন। বললেন, খিদে হচ্ছে না, পেটে বায়ুর প্রকোপ বেড়েছে, প্রেশার হাই, ঘনঘন বাথরুম পাচ্ছে।"

কাশীবাবু কাঁদোকাঁদো হয়ে বললেন, "ওসব যে আমারও হচ্ছে হে। সকালবেলাটায় বেশ ছিলুম, কিন্তু এখন বড় কাহিল লাগছে।"

"আচ্ছা, আপনার ওসব হতে যাবে কেন? আপনার নামে তো আর রাখালহরি নোটিশ দেয়নি!"

কাশীবাবু অবাক হয়ে বলেন, "নোটিশ! কীসের নোটিশ ?"

"সরকার বাহাদুরের তরফে রাখালহরির মাথার দাম এক লাখ টাকা ধার্য করে থানায় নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাখালহরি তার পাশেই পালটা নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে, দারোগার মাথার দাম সে দু'লাখ টাকা দেবে।"

"বলো কী! এত আস্পদ্দা! কানাইদারোগার দাপটে যে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়।"

"এখন আর খাচ্ছে না। বাঘ দেখলেই গোরু এখন অন্য ঘাটে জল খেতে যাচ্ছে। কানাইদারোগার কোমরের বেল্টে পাঁচটা ফুটো আছে, লক্ষ করেছেন কি? তাঁর পেটের যা বেড় ছিল, তাতে প্রথম ফুটোতেই বেল্ট বেশ আঁটসাঁট হত। এখন পাঁচ নম্বর ফুটোতে বেল্ট আটকেও তাঁর পাতলুন ঢলঢল করে। আম থেকে আমসি হয়ে গেছেন। এই হারে চলতে থাকলে একদিন এমন সূক্ষ্ম-শরীর-প্রাপ্ত হবেন যে, আপনার সামনে দিয়ে গটগট করে হেঁটে গেলেও আপনি কানাইদারোগাকে দেখতেই পাবেন না। থানায় একজন সেপাই ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল, সে ফিরে এসে দারোগাবাবুকে চিনতে না পেরে স্যালুট পর্যন্ত করেনি!"

চোখ কপালে তুলে কাশীবাবু বললেন, "বলো কী! দারোগাকে স্যালুট করেনি! সব্বোনেশে ব্যাপার। না হে, এ দেশে আর থাকা যাবে না।"

"এতেই ঘাবড়ে গেলেন কাশীদা! এখনও তো আপনাকে আসল কথাটা বলাই হয়নি।"

কাশীবাবু কাহিল মুখে বললেন, "এর পর আর কী কথা থাকতে পারে বলো তো! কানাইদারোগারই যদি এত হেনস্থা হয়, তবে আমরা তো কোন ছার! আকাশে ভগবান আর মর্ত্যধামে দারোগা পুলিশ ছাড়া আমাদের আর ভরসা কী বলো!"

"সে তো বটেই। তবু বাকিটা শুনলে কলির শেষে কী ঘটতে চলেছে তার একটা আঁচ পাবেন। রাখালহরি গড়াই সম্পর্কে আপনার কিছু জানা আছে কি?"

"না হে বাপু। শুধু শুনেছি, সে খাঁদুর খুড়ো।"

দ্বিজপদ মুচকি হেসে বলে, "তবু সেটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। সে হল ডাকাতেরও ডাকাত। সাধারণ ডাকাতরা গেরস্তর বাড়িতে চড়াও হয়ে লুঠপাট করে। রাখালহরি তা তো করেই, উপরন্তু সে ডাকাতদের উপরেও চড়াও হয়ে তাদের সর্বস্ব লুটেপুটে নিয়ে যায়। আগে যে-এলাকায় সে ছিল, সেখানে তার অত্যাচারে তিনজন ডাকাত সর্বস্বান্ত হয়েছে, দু'জন বিবাগী হয়ে গিয়েছে, একজন গলায় দড়ি দিতে গিয়ে স্যাঙাতদের হস্তক্ষেপে বেঁচে যায়, একজন পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দু'জন গিয়ে জেলখানায় আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বেঁচেছে।"

কাশীবাবু হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, "আর তারই ভাইপো কিনা আমাদের বাড়িতে বসে ডাল-রুটি সাঁটাচ্ছে! লোকটাকে যে এক্ষুনি পুলিশে দেওয়া দরকার!"

"ব্যস্ত হবেন না কাশীদা। রাখালহরির ভাইপো শুনলে পুলিশ তার ধারেকাছে যেতেও সাহস পাবে না। আর তার কিছু হলে রাখালহরিই কি আপনাকে আস্ত রাখবে? রাখালহরির ওয়ারিশন বলতে শুধু ওই ভাইপোটাই আছে। বংশে বাতি দিতে ওই একমাত্র শিবরাত্রির সলতে। রাখালহরির বয়স হয়েছে। লাখো লাখো টাকার একজন উত্তরাধিকারী চাই। তা ছাড়া সে বুড়ো হলে তার দলের হাল ধরার জন্যও উপযুক্ত লোক চাই। তাই রাখালহরি এখন হন্যে হয়ে তার ভাইপোকে খুঁজছে।"

"ওরে বাবা! তারা তো তা হলে এল বলে!"

"ঘাবড়াবেন না। রাখালহরি যত ভয়ংকরই হোক, এই পরগনার ডাকাতরাও তাকে ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নয়। তাদের তো

প্রেস্টিজ বলেও একটা ব্যাপার আছে। জল্লাদ-প্রহ্লাদ, গুঁফো গণেশ, হাড়ভাঙা হারাধন, লেঠেল ললিত বা সড়কি সতীশ, এরা কি কিছু কম যায়? রাখালহরিকে টিট করার জন্য তারা এখন সব এককাট্টা হচ্ছে। ঘনঘন গোপন বৈঠকে বসছে। রাখালহরির ওয়ারিশকে তারাও খুঁজছে।"

"দ্বিজপদ, তোমাকে একটা কথা কইব?"

"কী কথা কাশীদা?"

"তুমি কি জানো যে, ঝড়ে জানালার ভাঙা কপাট যেমন আছাড়ি পিছাড়ি করে, আমার বুকের ভিতরটায় এখন তেমনই হচ্ছে! আমাকে আর বেশি ভয় দেখানোটা কি তোমার উচিত? এখন হার্ট ফেল হয়ে গেলে এতটা পথ হেঁটে বাড়ি যাব কী করে? এখনও নাওয়াখাওয়া বাকি?"

"হার্ট ফেল হওয়া কি সোজা ? আপনার হল বীরের বংশ, ঠাকুরদা শশীরাম হরিরামপুরের ডাকসাইটে দারোগা ছিলেন, বাবা নসিরাম ছিলেন লড়াকু মিলিটারি।"

কাশীবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, "সেটাও বুঝি রে ভাই! আমার ভিতরেও যে বীর হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তা নয়। ইচ্ছেও যায়, তবে কী জানো, ওই ভয় ব্যাটাকে নিয়েই মুশকিল, যখনই বীরের মতো কিছু করতে যাই, তখনই ওই ব্যাটা ভয় এসে এমন বাগড়া দেয় যে, কাজটা ফসকে যায়। এই কদিন আগে মাঝরাতে চোর এসেছিল, জানালায় খুটখাট শব্দ শুনে ঘুম ভাঙতেই 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে গিয়েছি, অমনি পাশ থেকে ভয় ব্যাটা মুখ চেপে ধরে ধমক দিয়ে বলল, চুপ, চুপ, খবরদার চেঁচাসনি! চোরের কাছে অস্তর থাকে জানিস না?'এই তো গত হাটবারে সকালবেলায় মহিমবাবুকে ষাঁড়ে তাড়া করেছিল।

ভাবলাম, যাই, ষাঁড়টাকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে বুড়ো মানুষটাকে রক্ষে করি। হাতে লাঠিও ছিল। কিন্তু যেই তেড়ে যাব বলে পা বাড়িয়েছি, অমনি পিছন থেকে ওই ব্যাটা ভয় একেবারে কোমর জাপটে ধরে বলল, 'পাগল নাকি? ওই খ্যাপা ষাঁড়ের মুখখামুখি হতে আছে রে আহাম্মক? মানুষ তো অদৃষ্ট নিয়েই জন্মায়। মহিমবাবুরও অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, তুই বাগড়া দেওয়ার কে?' তোমার কাছে কি ভয় তাড়ানোর কোনও ওষুধ আছে হে দ্বিজপদ?"

দ্বিজপদ বলে, "আহা, ভয়কে তাড়ানোর জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আছে থাক না, তবে ভয়েরও মাঝে মাঝে ঝিমুনি আসবে, কিংবা ধরুন, মানুষের মতো তারও হয়তো ছোট বাইরে বা বড়-বাইরে পাবে, কিংবা ধরুন, পায়ের ঝিঝি কাটাতে ভয় হয়তো বারান্দায় পায়চারি করতে গেল, সেই ফাঁকে কাজ হাসিল করে নিলেই হয়।"

"কাজ হাসিল! কীসের কাজ হাসিল হে?"

"শক্ত কাজ করলে যে আপনার অম্বল হয়, একথা কে না জানে! কাজটা শক্ত তো নয়ই, বরং কাজ বললেও বাড়াবাড়ি হয়। কাজ না বলে বরং বলা ভাল, এই একজনকে একটু চোখে-চোখে রাখা আর কী।"

"আহা, সে আর শক্ত কী? নড়াচড়া বেশি না করতে হলেই হল, হুড়যুদ্ধ যে আমার সয় না, এ তো তুমি ভালই জানো!"

"তা আর জানি না! আপনার হল আদরের শরীর, সেবার আপনার দাদু শশীরামের হাম হওয়ায় তিনি হাটে যেতে পারেননি, তাই হাটবারে আপনাকে মোট আড়াই কেজি আলু বয়ে আনতে হয়েছিল বলে আপনি এক হপ্তা শয্যাশায়ী ছিলেন, সে কথা কি ভোলা যায়? তারপর সেই যে আপনার বাবামশাই নসিরাম একখানা ছোট তোশক ছাদে নিয়ে রোদে দিতে বলায় আপনার কম্প দিয়ে জ্বর এসেছিল, সেকথা কি বিস্মরণ হওয়ার? তারপর ধরুন, গত বছর যে আপনি গোরুর গাড়ির ধর্মঘটের দরুন দেড় মাইল হেঁটে মাসির বাড়ি

নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে হাঁটুর ব্যথায় কাতর হয়ে দেড় ডজন রসগোল্লা খেয়েই ক্ষান্ত দিয়েছিলেন, সে কথা বলে যে মাসি আজও হা-হুতাশ করেন, একথা কে না জানে বলুন! আপনাকে শক্ত কাজ দিলে ভগবান কি আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন?"

"আরে, ওসব পুরনো কথা আবার কেন? কাজের কথাটাই হোক ! কার উপর নজর রাখতে হবে?"

"আজ্ঞে, লোকটার নাম খাঁদু গড়াই।"

"ওরে বাবা! শুনেই বুকটা কেমন করছে! তা ছাড়া উঁকিঝুঁকি মারা খুব খারাপ। উঁকিঝুঁকি মারলে আমার বড় গা শিরশির করে।"

দ্বিজপদ খুব চিন্তিত মুখে ছাদের দিকে চেয়ে গলা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "তাই তো কাশীদা, বড় মুশকিলে ফেলে দিলেন। ভাবছি, বিজয়বাবুকে এখন কী বলি! সম্বন্ধটা যখন আমিই করেছি, তখন আমারও তো একটা দায়িত্ব আছে। তিনি বড় আশায় বুক বেঁধে রয়েছেন যে!"

কাশীবাবু তটস্থ হয়ে বললেন, "আহা, বিজয়বাবুকে আবার এর মধ্যে টানা কেন?"

"তিনি সাতবেড়ের শিকারি বিশ্বজয় রায়ের নাতি। বাবা ভুবনজয়ও ছিলেন পক-প্রণালী জয়ী বিখ্যাত সাঁতারু, কামট, কুমির, হাঙরকেও ডরাতেন না। আপনি যে এত ভিতু, সেটা পাঁচকান হলে বিজয়বাবু তাঁর মেয়ে বঁচির সঙ্গে আপনার বিয়ে দেওয়ার কথা আর কখনও উচ্চারণ করবেন কি? তাঁর তো ধারণা শশীরামের নাতি, নসিরামের ছেলে কাশীরামও বাপ-দাদার মতোই ডাকাবুকো লোক।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, না হয় খাঁদু গড়াইয়ের উপর নজর রাখব'খন। ও আর এমন কী শক্ত কাজ?"

"কাজ খুবই সোজা। খাঁদু কখন খায়, কখন ঘুমোয়, বাঁ ধারে কাত হয়ে ঘুমোয়, না ডান ধারে, হাঁ করে ঘুমোয় কিনা, নাক ডাকে কিনা, এই সব আর কী! তারপর ধরুন, দুপুরে বা নিশুতরাতে কোনও সন্দেহজনক লোক তার কাছে যাতায়াত করে কিনা বা সে কাউকে কোনও ইশারা ইঙ্গিত করে কিনা। কিংবা তার ঝোলায় কোনও অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা। পারবেন না?"

কাশীবাবু আমতা আমতা করে বললেন, "তা পারা যাবে বোধহয়।"

"খুব পারা যাবে, খুব পারা যাবে। তারপর শুধু নজর রাখাই নয়, মাঝে মাঝে তার কাছে গিয়ে একটু খেজুরে আলাপও জুড়ে দেবেন। এই জিজ্ঞেস করলেন, বাপু হে, তুমি কি মিষ্টি পছন্দ করো, না ঝাল? লাল রং ভালবাসো, নাকি বেগুনি? ঠান্ডা ভাল না গরম? এরকম আগড়মবাগড়ম যা খুশি বলে গেলেই হল, দেখবেন কথার ফাঁকে হয়তো টক করে আসল কথাটা বেরিয়ে আসবে।"

কাশীবাবুর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিয়ে বললেন, "সে তো বুঝলুম, কিন্তু আসল কথাটা কী?"

"সে কি আমিই জানি। এ হল ছিপ ফেলে বসে থাকার মতো ব্যাপার, মাছ উঠবে কিনা তার ঠিক নেই।"

"বুঝেছি। কী কুক্ষণে যে খাঁদু গড়াই এসে জুটল কে জানে!"

"ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন কাশীদা।"

কাশীবাবু একটু উত্তেজিত হয়ে বলেন, "এর মধ্যে মঙ্গলটা কী দেখলে শুনি! খাঁদু গড়াই হল ডাকাতের ভাইপো, তার উপর তান্ত্রিক পিশাচসিদ্ধ মানুষ। ওরকম বিপজ্জনক লোকের উপর নজর রাখা মানে তো সিংহের খাঁচায় ঢুকে পড়া, প্রাণ হাতে করে কাজ, এর মধ্যে মঙ্গলটা আসে কোত্থেকে?"

"নগদানগদি সব বোঝা যাবে না দাদা, ধৈর্য ধরতে হবে।"

"আর ধৈর্য! বাবামশাইকেও বলিহারি, যাকে-তাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেন। এই তো গত বছর এক সাধুকে ধরে এনেছিলেন তার কাছে আকাশে ওড়া শিখবেন বলে। শেষ পর্যন্ত সেই সাধু মায়ের একছড়া হার, দাদুর পকেটঘড়ি, তিনটে কাঁসার থালা, আমার গরদের পাঞ্জাবি আর নরহরির নতুন গামছাখানা নিয়ে পিঠটান দিল। তবু কি তাঁর শিক্ষা হয়? এবার কী হবে কে জানে!"

৪. গুঁফো গনশা বলিয়ে কইয়ে মানুষ

গুঁফো গনশা বলিয়ে কইয়ে মানুষ। বক্তৃতার শেষ দিকটায় সে আক্ষেপ করে বলল, "ভাল কোচিংয়ের অভাবেই আমরা এইসব অনুপ্রবেশকারী লুঠেরাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছি না। আমাদের প্রতিভা কিছু কম নেই, সাহস বা সংযমেরও অভাব নেই। ভাল ফরেন কোচ পেলে আমরা এলাকায় এখনও আধিপত্য করতে পারি। হ্যাঁ, আর দরকার হল অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, আর ভাল নেটওয়ার্ক।"

মারকুটে মহেশ ঝাঁকি মেরে উঠে দাড়িয়ে বলল, "ফরেন কোচের কোনও দরকার নেই, আমার গুরু জটাবাবা কি খারাপ কোচ ছিল ? এমন মুষ্টিযোগ, এত প্যাচপয়জার জানত যে, লোকে নামই দিয়েছিল 'জাদুকর জটাই', ভারতীয় যোগবিদ্যাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ।"

এই কথায় চাকু চপল আপত্তি করে বলল, "ওসব পুরনো যোগবিদ্যা এযুগে চলে না মশাই। এ হল কম্পিউটার, লেজার, স্ট্রেসারের যুগ, এ কে ফর্টি সেভেনের সামনে তো আর প্রাণায়াম দিয়ে লড়া যায় না। গোবিন্দদা ঠিকই বলেছে, অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র না হলে ওই রাখালহরির কাছে মুচলেকা দিয়ে এই এলাকায় বসবাস করতে হবে। যাকে বলে সেকেন্ড গ্রেড সিটিজেন।"

হাড়ভাঙা হারাধনের ডেরায় কাল রাতেই হানা দিয়ে রাখালহরি, তার সর্বস্ব লুটে নিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, বুকে এ কে ফর্টি সেভেনের নল ঠেকিয়ে কান ধরে ওঠবস করিয়ে গিয়েছে। সেই অবস্থায় এখনও তার চোখ ছলছল করছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত গলায় বলল, "আমি যদিও সনাতন পন্থাতেই বিশ্বাস করি, এবং জানি, আমাদের শিক্ষক ও ওস্তাদরা নানা গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, রাখালহরির বিদেশের ট্রেনিং থাকায় তার সঙ্গে আমি পেরে উঠিনি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, প্রথম জীবনে কুঠিবাড়ি লুট করে সে চিনে চলে গিয়েছিল। সেখানে কয়েক বছর চিনা কোচের কাছে প্রশিক্ষণ পায়। এই যে কাল রাতে সে আমার ছাউনিতে চড়াও হল, তার মোডাস অপারেন্ডি আমরা ধরতেই পারলাম না। ছাউনির চারদিকে শক্ত পাহারা ছিল, তবু সে কী করে যে ব্লিৎস ক্রিগ করে অত লোককে বোকা বানিয়ে অস্ত্র কেড়ে নিল, তা এখনও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। একথা ঠিক যে, আমি শক্তিশালী প্রতিপক্ষের কাছেই পরাজিত হয়েছি, কিন্তু ভাববার বিষয় হল, আমাদের মান উন্নত না করলেও আর চলছে না।"

জঙ্গলের পাশেই নদী, নদীর ধারের বালির চরে বড় বড় উনুনে বিরিয়ানি আর মাংস রান্না হচ্ছে। সঙ্গে স্যালাড, পাঁপড় ভাজা, দই আর মিষ্টি। ভোজ দিচ্ছে প্রহ্লাদ। লেঠেল ললিত রান্নার তদারকি সেরে এসে কোমরের গামছায় হাত মুছে বলল, "মিটিঙে যে সিদ্ধান্ত হবে সেটাই আমরা মেনে নেব বটে, তবু আমার নিজের দুটো কথা আছে, এই হাইটেক অপারেশনের যুগে কাজ করতে গেলে যে ফিটনেস এবং স্কিল দরকার, সেটা আমরা কোথায় পাব। ফরেন কোচ আমাদের স্কিল আর ছক শেখাতে পারে, কিন্তু ফিটনেস তো আলাদা ব্যাপার। তাই ফট করে বিদেশি কোচিং অ্যাডপ্ট করা ঠিক হবে না।"

কয়েকটি তরুণ কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ শোনা গেল। তাদের মুখপাত্র বাঘা বগলা উঠে সদর্পে বলল, "ললিতদা এখনও লাঠির মহিমা ভুলতে পারেননি। ঠিক কথা, ভূভারতে ললিতদার মতো লাঠিয়াল নেই, কিন্তু ওঁকে এখন বুঝতে হবে যে, লাঠির যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এমনকী সনাতন বন্দুক-বোমার যুগও আর নেই। আমরা যদি এখনও খোলনলচে না

পালটাই, তা হলে বারবার বিদেশি টিমের কাছে হার অনিবার্য। ফিটনেস আর স্কিল আমাদের নেই কে বলল? আসল হল প্র্যাকটিস এবং উপযুক্ত কোচিং। ঐতিহ্য আঁকড়ে পড়ে থাকার দিন শেষ। যুগের সংকেত যদি আপনারা ধরতে না পারেন, তা হলে আমাদের আরও পিছিয়ে পড়তে হবে। এই যে রাখালহরির দাপট এবং আধিপত্যকে আমরা এত ভয় পাচ্ছি, তার কারণ, রাখালহরির দলের সবাই অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণে শিক্ষিত, তাদের হাতে একেবারে হাল আমলের অটোমেটিক অস্ত্র এবং তাদের স্পিড অভাবনীয়। তাদের অ্যাটাকিং এবিলিটি যেমন সাংঘাতিক, ডিফেন্সও তেমনই মজবুত। এসব তো জাদুবিদ্যা নয়, কোচিং এবং প্রাকটিসই এর কারণ।"

সভাপতি মোটকা মল্লিক শান্তশিষ্ট মানুষ, স্বল্পভাষীও বটে, সব শুনে সে এবার বলল, "আমরা প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি, এখন যেটা আশু প্রয়োজন, সেটা হল, রাখালহরিকে নিয়ন্ত্রণ করা। সে বিষয়ে প্রহ্লাদা কিছু বলুন।"

প্রহ্লাদ নিমীলিত নয়নে বসে এতক্ষণ একটার পর একটা সুগন্ধি জরদা দেওয়া পান চিবিয়ে যাচ্ছিল। এবার পিক ফেলে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "দেখা যাচ্ছে, আমাদের ভিতরে সবাই স্পষ্ট দু' ভাগে বিভক্ত। অল্পবয়সিরা আধুনিক প্রশিক্ষণে বিশ্বাসী, বয়স্করা সনাতন কর্মপদ্ধতি বদলাতে অনিচ্ছুক। যাই হোক, আমরা কোন পন্থা নেব তা সভার শেষে ভোট নিলেই বোঝা যাবে। কিন্তু ফরেন কোচ বা অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বা প্রশিক্ষণ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ততদিন তো আর রাখালহরি বসে থাকবে না। তাই আমাদের এমন কিছু করতে হবে, যাতে রাখালহরিকে আপাতত নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আমার প্রস্তাব আমি আগেই তোমাদের কাছে দিয়ে রেখেছি। রাখালহরির এখন তিপান্ন বছর বয়স, সে বিয়ে করেনি। সুতরাং তার ওয়ারিশন নেই। একমাত্র ওয়ারিশ তার ভাইপো ক্ষুদিরাম বা খাঁদু গড়াই। আমাদের আড়কাঠিরা খবর এনেছে, সে খয়েরগড়ের কাশীরাম রায়ের বাড়িতে এসে থানা গেড়েছে। ভাইসব, এই খাঁদু গড়াই হল রাখালহরির দুর্বল জায়গা, তার অ্যাকিলিস ছিল। কারণ, রাখালহরি তার দলের হাল ধরার জন্য খাঁদুকেই হন্যে হয়ে খুঁজছে। সে খাঁদুর হদিশ পাওয়ার আগেই খাঁদুকে আমাদের হস্তগত করা চাই। তারপর আমরা রাখালহরির

উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ পাব। হিংসাত্মক পদ্ধতির বদলে কূটনৈতিক চালেই আমরা রাখালহরিকে বাগে আনতে চাই। তার ফলে তার সঙ্গে নেগোশিয়েট করার সুবিধে হবে। ভাইপোকে ফেরত পাওয়ার জন্য আমাদের শর্ত না মেনে তার উপায় থাকবে না। এ-প্রস্তাবে তোমরা রাজি থাকলে হাত ভোলো।”

প্রায় সবাই হাত তুলল। দু-একজন ঘুমোচ্ছিল বলে হাত তোলেনি।

মোটকা মল্লিক গম্ভীর গলায় বলল, “এখন জিরো আওয়ার। কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। তারপর মধ্যাহ্নভোজনের জন্য সভা মুলতুবি ঘোষণা করা হবে।”

সড়কি সতীশ ছোকরা মানুষ। ইসকুলে জ্যাভেলিন থ্রো-তে খুব নাম ছিল তার। পরবর্তীকালে সে বল্লম ছোড়ায় ওস্তাদ হয়ে ওঠে। সে উঠে বলল, “আমার প্রশ্ন হল, রাখালহরির ল্যাপটপে আমাদের সব স্ট্র্যাটেজিই অ্যানালিসিস করা আছে। তার পি আর-ও দুর্দান্ত, সেক্ষেত্রে তার ভাইপোকে পণবন্দি করা কি সহজ হবে? আমার তো সন্দেহ হয়, আমাদের এই টপ সিক্রেট মিটিঙেও রাখালহরির এজেন্ট মজুত আছে। এমনও হতে পারে, সেই এজেন্ট তার মোবাইল হ্যান্ডসেটে এই মিটিঙের সব খবরই তাকে জানিয়ে দিচ্ছে।”

একথায় সভায় একটা প্রবল হইচই উঠল। বাঘা বগলা বজ্রকণ্ঠে বলল, “মিটিঙের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছিল সবাইকে মোবাইল সুইচ অফ করে রাখতে হবে। কার মোবাইল অন আছে হাত তোলো।”

কেউ অবশ্য হাত তুলল না।

মোটকা মল্লিক মোটা গলায় বলল, “এই সাইবার পাইরেসির যুগে সবই সম্ভব। কিন্তু রিস্ক আমাদের নিতেই হবে। কারণ, রাখালহরির সঙ্গে টক্কর দিতে হলে সম্মুখসমরে পেরে ওঠা যাবে না। সে ধূর্ত এবং টেকনিক্যালি অনেক অ্যাডভান্সড। সুতরাং তার ভাইপোকে পণবন্দি করার প্রস্তাবটি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। লাঞ্চের আগেই আমাদের

কম্যান্ডো বাহিনীর নামের লিস্টি করে ফেলা দরকার। লাঞ্চের পর সভা সাইনে ডাই মুলতুবি করে দেওয়া হবে।”

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে উঠে প্রহ্লাদ বলল, “ভাইসব, আজ এক সংকটের মুখে আমরা যে সংহতির পরিচয় দিয়েছি, সেটাই আমাদের ভবিষ্যতের মূলধন। বহিরাগত শত্রু, হানাদার এবং অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হলে এই সংহতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমঝোতা বজায় রাখতে হবে। আপনারা সকলেই যে আজ এই প্রাতঃকালীন সভায় মতানৈক্য সরিয়ে এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব উপেক্ষা করে যোগ দিতে এসেছেন, তার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ... ইত্যাদি।”

সভায় প্রবল হাততালি পড়ল। আর ঠিক এই সময়ে বিরিয়ানিতে গোলাপজল আর কেশর পড়ায় ভারী সুন্দর গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

সভাস্থল থেকে মাইলসাতেক দুরে নীলপুরের গভীর জঙ্গলের মধ্যে গোলপাতার একটা বড় ছাউনির ভিতরে হেডফোনটা কান থেকে খুলে রাখল রাখালহরি। তিপ্পান্ন বছর বয়সেও তার চেহারায় বিন্দুমাত্র মেদ নেই। ছিপছিপে চাবুকের মতো শরীর, রীতিমতো মাসকুলার হাত-পা।

ঘরের এক কোণে বসে একজন বেঁটেখাটো লোক কম্পিউটারে একটা মুখের ছবি আঁকার চেষ্টা করছিল। তার দিকে চেয়ে রাখালহরি বলল, “তোর হল রে কালীকেষ্ট?”

কালীকেষ্ট মৃদু স্বরে বলল, “আজ্ঞে, হয়ে এল। মুশকিল হল, আপনি যখন আপনার ভাইপোকে শেষবার দেখেন, তখন তার বয়স সাত-আট বছর, সে বয়সের চেহারার বিবরণ ধরে তার এখনকার মুখের আদল আন্দাজ করে যা দাঁড়াচ্ছে, তা কি আপনার পছন্দ হবে?”

রাখালহরি গম্ভীর গলায় বলে, “দেখি, একটা প্রিন্ট বের করে দেখা তো।”

কালীকেষ্ট একটা প্রিন্ট নিয়ে এলে রাখালহরি সেটা দেখে মমাটেই পছন্দ করল না। ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে বলল, "না, আমার মতো হয়নি ব্যাটা। মুখে সেই হারমাদের ভাবটাই নেই, চোখের চাউনিও তো মরা মাছের মতো। ব্যাটা ওর বাপের মতোই হয়েছে তা হলে। দাদা চিরকালই ভেড়ুয়া টাইপের ছিল।"

"যদি বলেন তা হলে একটা জম্পেশ গোঁফ লাগিয়ে দিতে পারি।"

"তাতে লাভ কী! লোকটা তো তাতে বদলাবে না। যাক গে, কী আর করা যাবে। শত হলেও রক্তের সম্পর্ক। একেই গড়েপিটে নিতে হবে।"

"আজ্ঞে, সে আর বেশি কথা কী? আপনি কিলিয়ে কত কাঁঠাল পাকালেন, চোখের সামনেই তো দেখলাম। দেখবেন একদিন, এই গোলগাপ্পা ভাইপোও একদিন গুন্ডাপ্পা হয়ে উঠবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাখালহরি বলল, "আর সময় নেই, মহিষবাথানের জঙ্গলে ওদের মিটিঙের রিলে শুনছিলাম নয়ন দাসের সেলফোন থেকে। ওরা আজই খাঁদুকে তুলে আনবে। কম্যান্ডো লিস্ট তৈরি হচ্ছে। তার আগেই যদি খাঁদুকে সরিয়ে ফেলা না যায়, তা হলে মুশকিল। তুই এক্ষুনি হাবু, সনাতন, গদাই আর গাব্বকে ডেকে আন।"

"যে আজ্ঞে," বলে কালীকেষ্ট তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ছাউনির মধ্যে সিংহের মতো পদচারণা করতে করতে রাখালহরি একা-একাই বলতে লাগল, "কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যারবি, শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী, আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি। কোটি কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট, বিশাল নেটওয়ার্ক, ম্যান ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স, পাবলিক রিলেশন, অ্যাকাউন্টস, নিউ ভেঞ্চার, অপারেশন, একটিও কি ব্যাটা পারবে সামাল দিতে!"

নিঃশব্দে ছাউনিতে ঢুকে হাবু, সনাতন, গদাই আর গাব্ব ভারী বশংবদ ভঙ্গিতে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। আরও কিছুক্ষণ পায়চারি করে রাখালহরি তাদের সামনে স্থির হয়ে দাড়িয়ে

বলল, “অপারেশন খাঁদু। প্ল্যান সিক্স। গাঁয়ের নাম মামুনগড়। কাশীরাম রায়ের বাড়ি। সন্ধে ছ’টার মধ্যে কাজ হাসিল করা চাই। প্রিন্ট আউটের ছবিটা দেখে নে ভাল করে। ছবির সঙ্গে চেহারা না-ও মিলতে পারে। ছেলেবেলায় ঘুড়ি ধরতে গিয়ে একবার মাঞ্জা সুতোয় খাঁদুর কান কেটে যায়। কানের পিছনে কাটা দাগ দেখবি। সাবধান, ভুল লোককে তুলে আনিস না। আইডেন্টিফিকেশন মার্কটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।”

“যে আজ্ঞে ! ”

“আর কোনও প্রশ্ন আছে?”

সনাতন বলল, “যে আজ্ঞে, কোন কান? বা না ডান?”

রাখালহরি ফের কিছুক্ষণ পায়চারি করে বলল, “যত দূর মনে আছে, বাঁ কান। তবে ডান কান হওয়াও বিচিত্র নয়। এবার বেরিয়ে পড়ো।”

চারজন নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

রাখালহরি তার ল্যাপটপ খুলে নিবিষ্ট মনে কাজ করতে লাগল।

মাত্র মাইল পনেরো দূরে মামুনগড় গাঁয়ে শশীরাম রায়ের বাড়িতে কাশীরাম রায় খুবই বিপন্ন বোধ করছেন। উঁকিঝুঁকি ব্যাপারটা তার একদম পছন্দ নয়। কেউ আড়াল থেকে লুকিয়ে উঁকি মেরে তাঁকে লক্ষ করছে, এ কথা ভাবলেই তার গা শিরশির করে। এইজন্য ছেলেবেলায় চোর-চোর খেলার সময় তিনি টেনশন সহ্য করতে না পেরে এই যে আমি’ বলে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে সদর্পে ঘোষণা করে দিতেন। এই উনত্রিশ-ত্রিশ বছর বয়সে ফের সেই ছেলেবেলার টেনশনটা টের পাচ্ছেন তিনি।

দুনিয়াসুদ্ধ লোক যে কেন বীর বা সাহসীদের ভক্ত তা তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না। দুঃসাহসিক কাজ করতে গিয়ে নিজেকে বিপদে ফেলা কি ভাল? সেটা কি দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ নয়? ভূত-প্রেত, গুন্ডা বদমাশ, মারকুটে বা রাগী লোক,

বাঘ ভালুক এসব তো ভয় পাওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, নাকি? সুতরাং ভয় পাওয়াটাও তো নিয়মের মধ্যেই পড়ে! কিন্তু তার দাদু শশীরাম বা বাবা নসিরাম তা বোঝেন কই? দাদু শশীরাম প্রায়ই বলেন, 'কেশোটা চোর-ডাকাত হলেও ভাল ছিল। তা হলেও বুঝতাম, একটা তালেবর হয়েছে। কিন্তু এ তো বংশের নাম ডোবাল! এমন ভিতু, কাপুরুষ, এমন ব্যক্তিত্বহীন ছেলেকে যে নিজের নাতি বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা করে! কাশীবাবুর বাবা নসিরাম তো আরও এক ডিগ্রি সরেস। তিনি তাঁর পুত্রের উপর এতই বিরক্ত যে, প্রাতঃকালে তার মুখদর্শন অবধি করেন না। সারাদিন কুলাঙ্গার' বলে গালি দেন। কাশীরামের ভরসা হল, মা আর ঠাকুরমা। তাঁরা তাঁর পক্ষ নেন বটে, কিন্তু বাবা বা দাদু তাঁকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করেন না।

ঠাকুরমা প্রায়ই বলেন, "ভয়-ভীতি থাকাই তো ভাল। তোর বাপু, বাপ-দাদার মতো আহাম্মক হওয়ার দরকার কী? তোর দাদু বীরত্ব ফলাতে গিয়ে তো কতবার মরতে বসেছে। সেবার হিরু গুন্ডার দায়ের কোপে গলা অর্ধেক নেমে গিয়েছিল। বাঁচার কথাই নয়। শশধর ডাক্তার আর পাঁচকড়ি কবরেজের মতো ধন্বন্তরি ছিল বলে, গলা জোড়া লাগল। তোর বাপেরই কি বুদ্ধিসুদ্ধি আছে? গোলা বারুদের সামনে বুক চিতিয়ে বীরত্ব দেখাতে গিয়ে কতবার মরতে বসেছে। এখনও নাকি একটা গুলি পাঁজরে সেঁধিয়ে আছে, বের করা যায়নি।"

মা বলেন, "তুই যেমন আছিস তেমনই থাক বাবা, অন্যরকম হয়ে কাজ নেই তোর। তোর বাপ-দাদার হল ষণ্ডা-গুন্ডার ধাত, ভদ্দরলোকদের ওরকম হওয়ার তো কথাই নয়।"

কিন্তু সমস্যা হল বিজয়বাবু। দুর্ভাগ্যবশত তিনি একজন বীরপূজারি। বীর জামাই না হলে মেয়ের বিয়েই দেবেন না। তাই শশীরামের নাতি আর নসিরামের ছেলে এই কাশীরামকে মেয়ে বঁচির জন্য দেগে রেখেছেন।

সম্বন্ধটা এনেছে দ্বিজপদ। শশীরাম একদিন দ্বিজপদকে ডেকে বলেছিলেন, "তুই তো ঘটকালিও করিস। দ্যাখ তো বাবা, ডাকাবুকো, ডানপিটে হান্টারওয়ালি গোছের একটা

মেয়ে পাস কিনা। আমার অপোগণ্ড, ভিতুর ডিম, কাপুরুষ নাতিকে ওই মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে দেব। ডাকাবুকো একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে যদি ওর একটু উন্নতি হয়।”

তা বুচিকে সকলেরই খুব পছন্দ। সে নাকি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ায়। বন্দুক-পিস্তলে অব্যর্থ হাত, যুযুৎসু জানে, স্কুলের স্পোর্টসে গাদা গাদা প্রাইজ পায়। কুঁচির বিবরণ শুনে কাশীবাবু খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। বিয়েটা ভেঙে দেওয়ারও ফন্দি এঁটেছিলেন। কিন্তু সে-কথা ধানাইপানাই করে ব্যক্ত করার পরই মা হুমকি দিলেন, বাপের বাড়ি চলে যাবেন, ঠাকুরমা কাশীবাসী হওয়ার সতর্কবার্তা জারি করলেন, বাবা আর দাদু সন্ন্যাস নেওয়ার কথা আগাম ঘোষণা করে দিলেন। অগত্যা কাশীরামকে প্রস্তাবটা মেনে নিতে হয়েছে।

গত কাল থেকে খাঁদু গড়াই তাদের বাড়িতে বহাল তবিয়তে রয়েছে। কাশীরামের মাথায় আসছে না, তার বাবামশাই নসিরাম কেন খাঁদুকে একজন ডাকসাইটে ডাকাত বানানোর জন্য মেহনত করছেন। ডাকাত কি সমাজবিরোধী নয়? ইন্ডিয়ান পেনাল কোড কি ডাকাতিকে বিধিসম্মত পেশা হিসেবে স্বীকার করে ? কিন্তু নসিরামকে কার সাধ্য সেকথা বোঝায়? ওঁর গোঁ, খাঁদুকে এমন ডাকাত বানাবেন যে, পরগনার অন্য সব ডাকাত জব্দ হয়ে যাবে।

খাঁদু দিব্যি ডেঁড়েমুশে খাচ্ছোচ্ছে, দিব্যি ফুরফুরে মেজাজে বাড়ির মধ্যে ঘুরঘুর করছে। আর যতই খাদু গেড়ে বসছে ততই কাশীবাবু নার্ভাস বোধ করছেন। খাঁদুর জন্য যে এ বাড়িতে যে কোনও সময়ে রাখালহরি বা রাখালহরির প্রতিপক্ষ হামলা করতে পারে, এটা জেনে ইস্তক কাশীবাবুর খাওয়া অর্ধেক এবং ঘুম সিকিভাগ হয়ে গিয়েছে। তার উপর নজর রাখার মোটেই ইচ্ছে ছিল

কাশীরামের। কিন্তু দ্বিজপদ বিপদের ভয় দেখিয়ে রেখেছে, বিজয়বাবুকে বলে দেবে।

ঘনঘন জল খেয়ে, বারকয়েক বাথরুম ঘুরে এবং গোপনে একটু ডনবৈঠক দেওয়ার পর কাশীবাবু খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে নীচের তলার একটেরে ঘরটার শিয়রের জানালার কাছে গিয়ে আড়াল হয়ে দাড়ালেন। তারপর অতি সাবধানে একটা চোখ দিয়ে ভিতরে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন না, ভয়ের কিছু নেই। দুপুরে মাংস-ভাত খেয়ে খাঁদু দিব্যি মাদুরে হাতে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। নজর রাখতে কোনও ভয় নেই।

সবে বুকে একটু সাহস ফিরে আসছিল, ঠিক এই সময়ে খাদু তার দিকে না তাকিয়েই বলে উঠল, “কাশীবাবু যে! কী সৌভাগ্য! আসুন! আসুন!”

কাশীবাবু ভারী অপ্রস্তুত। খাঁদু গড়াইয়ের মাথার তালুতে কি তৃতীয় নয়ন আছে? নইলে তাকে দেখল কী করে?

খাঁদু উঠে বসে তার দিকে চেয়ে লাজুক হেসে বলে, “আজ্ঞে, আস্তাজ্ঞে হোক, বস্তাজ্ঞে হোক।”

কুণ্ঠিত পায়ে এবং উৎকণ্ঠিত মুখে কাশীবাবু ঘরে ঢুকে আমতা আমতা করে বললেন, “তা ইয়ে, বলছিলাম কী, তোমার কোনও অসুবিধে টসুবিধে হচ্ছে না তো!”

খাঁদু চোখ বড় বড় করে বলে, “বলেন কী মশাই, অসুবিধে কীসের? তোফা আছি। দোবেলা ফাঁসির খাওয়া খাচ্ছি, ঘুমও হচ্ছে মড়ার মতো, না মশাই, আপনাদের অতিথি-সকারের নিন্দে কেউ করতে পারবে না। তা কাশীবাবু, মাতব্বরদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে এসেছেন তো!”

কাশীবাবু অবাক হয়ে বললেন, “কীসের শলাপরামর্শ? কে মাতব্বর?”

খাঁদু ডবল অবাক হয়ে বলে, “করেননি? সে কী মশাই? এই যে আমি একটা উটকো লোক হুট করে আপনাদের বাড়িতে ঢুকে পড়লুম, এটা কি ভাল হল? তার উপর লোকটা এক সাংঘাতিক ডাকাতের ভাইপো। না মশাই, এরকম ঘটনা ঘটলে মুরুব্বি মাতব্বরদের

সঙ্গে শলাপরামর্শ করাই তো উচিত। কী থেকে কী হয় তা তো বলা যায় না। দিনকাল মোটেই ভাল নয়। ভালমানুষ বলে মনে হলেও আসলে আমি কেমন মানুষ, কোন মতলব আঁটছি, এসব খতিয়ে না দেখাটা আপনার উচিত হচ্ছে না।”

কাশীবাবু ফাঁপরে পড়ে বললেন, “তা ইয়ে, তা কাল সকালে যে তুমি বলেছিলে, তুমি ধর্মভীরু লোক!”

খাঁদু গম্ভীর হয়ে গলা নামিয়ে বলল, “আহা, আমি বললেই আপনি সেকথা বিশ্বাস করবেন কেন? আজকাল কি কাউকে বিশ্বাস করতে আছে মশাই? ধরুন কেন, আপনার মা ঠাকরুনের গলার বিছোরখানার না হোক দশ বারো ভরি ওজন, আপনার ঠাকুরমা ঠাকরুনের বালাজোড়াও, তা ধরুন, পনেরো ভরির নীচে হবে না। তারপর ধরুন আলমারির লকারে, সিন্দুকে, পাটাতনের উপর পুরনো ন্যাকড়ার পুঁটলিতে, আরও ধরুন, এক-দেড়শো ভরি গয়না তো আছেই। আর নগদ টাকাই কিছু ফ্যালনা হল! বুড়ো কর্তার হাতবাক্সে সবসময় দশ-বিশ হাজার টাকা মজুত। কর্তাবাবার লোশকের তলায় তো টাকার হরির লুট। তাই বলছি, বাইরের অজানা-অচেনা লোককে ঠাঁই দিয়ে যে আতান্তরে পড়বেন মশাই!”

কাশীবাবুর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, এবাড়িতে যে এত গয়না আর টাকা আছে, এ-খবর তাঁরও জানা ছিল না। তোতলাতে তোতলাতে বললেন, “তু-তুমি এ-এসব জা-জানলে কী কী করে?”

“সে আর শক্ত কী? চোখ আর মগজ থাকলেই জানা যায়। কর্তাবাবারই কী আক্কেল বলুন, দুটো মন-রাখা কথা কইতেই উনি একেবারে গলে গিয়ে আমাকে খাতির করে প্রায় অন্দরমহলে ঢুকিয়ে ফেলেছেন।”

কাশীবাবু কাঁদোকাঁদো হয়ে বললেন, “তা হলে উপায়?”

"আমি বলি কী কাশীবাবু, আপনি খুব হুঁশিয়ার হয়ে আমার উপর নজর রাখুন। এই ধরুন, আমি সারাদিন কী করি, বাইরের কেউ আমার কাছে যাতায়াত করে কিনা, ঠারেঠোরে বা ইশারা ইঙ্গিতে কাউকে খবরাখবর পাঠাচ্ছি কিনা, তারপর ধরুন, আমি লোকটা কেমন, হাঁ করে ঘুমোই কিনা, নাক ডাকে কিনা..."

কাশীবাবু সোৎসাহে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্বিজপদ তো এসব কথাই বলেছিল!"

বলেই কাশীবাবু জিভ কাটলেন। এঃ হেঃ, দ্বিজপদর কথাটা বেফাঁস বেরিয়ে গিয়েছে। সামাল দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, "না, না তোমার কথা হচ্ছিল না হে, এই চোর-ছ্যাঁচোড়দের কথাই হচ্ছিল আর কী!"

খাঁদু মাথা নেড়ে বলে, "আহা, আমার কথা হলেই বা দোষ কী? ভাল লোক তো কারও গায়ে লেখা থাকে না মশাই। চোখে চোখে রাখাই বিচক্ষণতার কাজ। উঁকিঝুঁকি মারারও কোনও দরকার নেই। সোজা এসে আমার নাকের ডগায় গেড়ে বসে বলবেন, তোমার উপর নজর রাখছি হে।"

কাশীবাবু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "সেটা কি ভাল দেখাবে? তুমি তো কিছু মনে করতেও পারো!"

"না, মশাই না। আনাড়ি লোকদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে আমি বড় ভালবাসি। গোলমেলে লোকদের উপর কী করে নজর রাখতে হয়, কী করে তাদের পেটের কথা টেনে বের করতে হয়, তার দু চারটে কায়দা আপনাকে শিখিয়ে দেব' খন।"

কাশীবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্বিজপদও এরকমই কী যেন বলছিল।"

"পাকা মাথার লোক তো বলবেই। তবে কিনা নজর রাখাও বড় চাট্টিখানি কথা নয়। আপনি হয়তো উকি দিয়ে দেখলেন, আমি বাঁ দিকে কাত হয়ে শুয়ে হাঁ করে ঘুমোচ্ছি। ভাবলেন, আহা, খাঁদু ঘুমোচ্ছে যখন ঘুমোক, আমিও গিয়ে তা হলে একটু গড়িয়ে নিই।

ব্যস, ওইখানে মস্ত ভুল করে ফেললেন। ওই যে বাঁ দিকে কাত হয়ে শোওয়া, হাঁ করে থাকা, ও-সবই হচ্ছে নানারকম সংকেত, ওর ভিতর দিয়েই কথা চালাচালি হয়ে যাচ্ছে, আপনি ধরতেও পারলেন না।”

“অ্যাঁ!” বলে মস্ত হাঁ করলেন কাশীবাবু।

“হ্যাঁ মশাই, শুধু কি তাই, যদি নাক ডাকে তা হলে জানবেন ওই সঙ্গে আরও মেসেজ চলে গেল। নাক ডাকারও আলাদা অর্থ আছে, যা আপনার জানা নেই। তারপর ধরুন, আমি হয়তো বসে বসে হাই তুলছি বা আঙুল মটকাচ্ছি বা আড়মোড়া ভাঙছি, ভুলেও ভাববেন না যে, আলসেমি করছি। ও সবই হল নানারকম ইশারা ইঙ্গিত। আপনি যেমন আমার উপর নজর রাখছেন, তেমনই বাইরে ওই পাঁচিলের উপর বা ঝুপসি আমগাছের ডালপালার ভিতর থেকে দুরবিন কষে আর কেউও আমার দিকে নজর রাখছে। আর সব টুকে নিচ্ছে।”

কাশীবাবু এত অবাক আর বিহ্বল হয়ে গেলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে প্রথমটায় কোনও কথাই বেরোল না। কী সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছেন তা ভেবে তাঁর শরীর ঠান্ডা হয়ে আসছিল। অনেকক্ষণ পরে শুধু বলতে পারলেন, “ওরে বাবা!”

“তাই বলছি আমি থাকতে থাকতে সব শিখে নিন। দিনকাল যা পড়েছে, চারদিকে চোখ না রাখলে যে বিপদ!”

৫. কাশীবাবু সামনের বাগানে

ঘণ্টাখানেক পরে যখন কাশীবাবু সামনের বাগানে একটা মোড়া পেতে বসে আছেন, তখনও তাঁর মাথাটা ভোম্বল হয়ে আছে। চোখের সামনে যা আছে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর মাথার মধ্যে কেবল ঘুরছে, বাঁ পাশে কাত হয়ে হাঁ করে ঘুমালে এক রকম সংকেত, নাক ডাকলে তার এক অর্থ, হাই তুললে আবার অন্য ইশারা, আঙুল মটকালে

বা আড়মোড়া ভাঙলে আর-এক ইঙ্গিত, এই সংকেতময় নতুন বিষয়টা অনুধাবন করার পর তাঁর বাহ্যজ্ঞান নেই। ওঃ, পৃথিবীতে কত কিছু শেখার আছে। ওকালতি পাশ করে তাঁর তো তেমন জ্ঞানার্জনই হয়নি! এই যে নতুন একটা জগতের দরজা তাঁর সামনে খুলে দিল খাঁদু, তার বিস্ময়, তার রোমাঞ্চই আলাদা। কাশীরাম আজ অভিভূত, বিস্মিত, বাকরহিত।

এরকম তুরীয় অবস্থা না হলে কাশীবাবু ঠিকই টের পেতেন যে, তাঁদের বাড়ির সামনে এই পড়ন্ত বিকেলে একটা পুলিশের জিপ এসে থামল। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা চারজন লোক নিঃশব্দে নেমে ফটক খুলে ভিতরে ঢুকল। অগ্রবর্তী লোকটার হাতে একটা

কম্পিউটারে আঁকা ছবি, সে বাগানে ঢুকেই সামনে সম্পূর্ণ আনমনা কাশীবাবুকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে ছবিটার সঙ্গে তাঁর চেহারাটা মিলিয়ে বলে উঠল, “এই তো!”

বাকি তিনজনও ছবিটা দেখে কাশীবাবুর সঙ্গে চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করে খুশি হয়ে বলল, “বাঃ, মেহনতই করতে হল না।”

“তবু কানের দাগটা দেখে নেওয়া ভাল। ভুল হলে সর্দার আস্ত রাখবে না।”

একজন গিয়ে কাশীবাবুর পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর কানটা উলটে দেখে নিয়ে বলল, “বাঃ, এই তো কাটা দাগ!”

এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরও কাশীবাবু কিছুই টের পেলেন না। শুধু বাঁ কানে একবার হাত বুলিয়ে গভীর অন্যমনস্কতার সঙ্গে বললেন, “ও কিছু নয়। ছেলেবেলায় ঘুড়ি ধরতে গিয়ে মাঞ্জা সুতোয় কেটে গিয়েছিল!”

সর্দার গোছের পুলিশটা এগিয়ে এসে বলল, “পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ। আপনাকে আমরা একটা ডাকাতির চার্জে অ্যারেস্ট করতে এসেছি।”

বলেই লোকটা কাশীবাবুর হাতে একজোড়া হাতকড়া পরিয়ে দিল, অন্য একজন একটা মোটা দড়ির এক প্রান্ত চট করে কোমরে বেঁধে ফেলল।

কাশীবাবু এবার যেন মাটিতে পা রাখলেন। ভারী অবাক হয়ে বললেন, "এসব হচ্ছে কী? আঁ! এসব কী ব্যাপার?"

আর ঠিক এই সময়েই কাশীবাবুর দাদু শশীরাম তাঁর বৈকালিক ভ্রমণ সেরে ফিরে ফটক খুলে ঢুকেই পুলিশ দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তিনি বিশাল মাপের পুরুষ, হাতে মোটা লাঠি, বাজখাই গলায় বললেন, "আমার বাড়িতে পুলিশ কেন হে? কী হয়েছে?"

কর্তাগোছের লোকটা বিনয়ের সঙ্গেই বলল, "আমরা এঁকে অ্যারেস্ট করতে এসেছি। এই যে ওয়ারেন্ট।"

শশীরাম ওয়ারেন্টের কাগজখানাকে মোটে গ্রাহ্যই করলেন না। গলাটা নামিয়ে বললেন, "ওরে বাপু, চার্জটা কীসের সেটা বললেই তো হয়।"

"আজ্ঞে, ডাকাতির। তিন-তিনটে দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিক ডাকাতি।"

শশীরাম বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, "বলো কী হে? সত্যি নাকি? না মশকরা করছ?"

"আজ্ঞে, মশকরা নয়।"

শশীরাম ভারী আহ্লাদের সঙ্গে একগাল হেসে বললেন, "ডাকাতির কেস, ঠিক তো!"

"আজ্ঞে, ডাকাতির কেসই।"

শশীরাম আহ্লাদে ফেটে পড়ে লাঠিন্ধু দু'হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "জয় মা কালী! জয় করালবদনী! এত দিনে মুখ তুলে চাইলে মা! ওরে ও নসে! ও গিন্নি!

ও বউমা! আরে তোমরা সব ছুটে এসো। দ্যাখো, আমাদের কেশো কী কাণ্ড করেছে। আগেই জানতুম, এই বীরের বংশে কাপুরুষ জন্মাতেই পারে না!”

হাঁকডাকে নসিরাম ছুটে এলেন। পিছু পিছু কাশীবাবুর ঠাকুরমা কমলেকামিনী দেবী, মা নবদুর্গা।।

নাতির অবস্থা দেখে কমলেকামিনী দেবী ডুকরে উঠলেন, “ওরে এই অলপ্পেয়ে মিনসেগুলো কে রে, আমার কেশোকে অমন করে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধেছে! আঁশবটিটা নিয়ে আয় তো রে মালতী, দেখি ওদের মুবোদ!”

শশীরাম গর্জে উঠে বললেন, “খবরদার, ওসব কোরো না। ওরা আইনমাফিক কাজ করছে। যাও বরং, শাঁখটা নিয়ে এসো। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি করো সবাই। এত দিনে ব্যাটা বুকের পাটা দেখিয়েছে!”

কমলেকামিনী দেবী আকাশ থেকে পড়ে বললেন, “শাঁখ বাজাব! উলু দেব! কেন, কোন মোচ্ছব লেগেছে শুনি! আমার দুধের বাছাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ! আজ কোথায় তোমার বীরত্ব? হাতের লাঠিগাছা দিয়ে দাও না ঘা কতক।”

শশীরাম মাথা নেড়ে বললেন, “না, না, ও তুমি বুঝবে না। স্নেহে অন্ধ হলে কি এসব বোঝা যায়! এত দিনে তোমার কেশো মানুষের মতো মানুষ হল, বুঝলে! ওই ম্যাদামারা, নাদুসনুদুস, অপদার্থ, কাপুরুষ ছেলে কি এবংশে মানায়! আজ ছাইচাপা আগুন বেরিয়ে পড়েছে গিন্নি, আজ দুঃখের দিন নয়, আনন্দের দিন।”

নসিরাম প্রথমটায় ব্যাপার বুঝতে পারেননি। এখন খানিকটা বুঝে তিনিও গোঁফ চুমরে বললেন, “ডাকাতি করেছে নাকি ব্যাটা?”

শশীরাম বুক চিতিয়ে বললেন, “তবে! ডাকাতি বলে ডাকাতি? তিন-তিনটে দুর্ধর্ষ ডাকাতি। এই তো পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে দ্যাখো না।”

নসিরাম পুলিশের সদারকে বললেন, "সত্যি নাকি?"

"যে আজ্ঞে।" কাশীরাম এতক্ষণে ফাঁক পেয়ে বললেন, "না, না, এসব বানানো গল্প।"

নসিরাম গর্জন করে বললেন, "চোপ! ডাকাতি করেছিস তো করেছিস। তার জন্য অত মিনমিন করে কাঁদুনি গাওয়ার কী আছে! বুকের পাটা আছে বলেই করেছিস। মাথা উঁচু করে জেল খেটে আয় তো দেখি!"

নসিরাম আহ্লাদে ফেটে পড়ে বললেন, "আহা, ডাকাতি তেমন খারাপ জিনিসই বা হতে যাবে কেন? চেঙ্গিস খাঁ থেকে আলেকজান্ডার, সুলতান মামুদ থেকে ভাস্কো ডা গামা, কে ডাকাত নয় রে বাপু? আগেকার রাজারাজড়ারাও তো বাপু, বকলমে ডাকাত ছাড়া কিছু নয়। রবিন হুডকে নিয়ে তবে নাচানাচি হয় কেন? ও গিন্নি, ওকে বরং একটা চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দাও। ওরে তোরা শাঁখ বাজা, উলু দে, পাঁচজনে জানুক।"

নবদুর্গা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, "ও যে রাতে দুধভাত খায়, নরম বিছানা ছাড়া শুতে পারে না, ভূতের ভয়ে একলাটি থাকতে পারে না, জেলখানায় গেলে কি ও আর বাঁচবে। সেখানে লপসি খাওয়ায়, কুটকুটে কম্বলের উপর শুতে দেয়, মারধর করে। খবর রটলে যে বিনয়বাবু বঁচির সঙ্গে ওর বিয়ে ভেঙে দেবেন।"

শশীরাম মোলায়েম গলায় বললেন, "বীরের জননী হয়ে কি তোমার এসব বিলাপ মানায় বউমা? আপাতদৃষ্টিতে ডাকাতি জিনিসটা ভাল নয় বটে, কিন্তু এ তো ভেড়ুয়াদের কাজ নয় বউমা। পুরুষকার লাগে। কেশোর ভিতরে যে পুরুষকার জেগেছে তা কি টের পাচ্ছ? আহা, আজ যে আনন্দে আমার চোখে জল আসছে!"

বলে শশীরাম ধুতির খুঁটে চোখ মুছলেন। নসিরাম পুলিশের দিকে চেয়ে বললেন, "ওহে বাপু, তোমাকে তো ঠিক চেনা চেনা ঠেকছে না!"

"আজ্ঞে, এই সবে নতুন বদলি হয়ে এসেছি।"

"আর তোমাদের কানাইদারোগা ! সে এল না?"

"আজ্ঞে, তিনি আর-একটা থানায় বদলি হয়ে গেছেন।"

শশীরাম বললেন, "খুব ভাল হয়েছে। কানাইদারোগা কোনও কম্মের নয়। ওরে বাপু, তোর নাকের ডগায় একটা লোক তিন তিনটে ডাকাতি করে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তোর হুঁশই নেই! ওহে বাপু, তোমাদের একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়ছি না। ওরে নরহরি, যা তো, দৌড়ে গিয়ে হারুময়রার দোকান থেকে এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে আয়।"

নরহরি পড়ি-কি-মরি করে ছুটল।

শশীরাম পুলিশ অফিসারটিকে ভারী বন্ধুর মতো বললেন, "শোনো বাবারা, জাঁতা পেষাই করাবে, পাথর ভাঙাবে, ঘানিগাছে ঘোরাবে। কোনওটা যেন ফাঁক না যায়। একেবারে মজবুত করে গড়ে দাও তো বাবা ছেলেটাকে।"

ছোকরা মুচকি হেসে বলল, "ওসব নিয়ে ভাববেন না। আমাদের হাতে পড়লে দু'দিন পরেই এঁর ভোল পালটে যাবে।"

"খুব ভাল, খুব ভাল, তা তোমরা দুর্গা দুর্গা বলে এসো গিয়ে। দেরি করে কাজ নেই। শুভ কাজে কখন কী বাধা এসে পড়ে, বলা তো যায় না।"

নরহরিও হাঁপাতে হাঁপাতে রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে এসে হাজির হয়ে গেল। চারজন পুলিশ টপাটপ রসগোল্লা সাফ করে দিল কয়েক মিনিটেই। তারপর জিপে উঠে কাশীবাবুকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

কমলেকামিনী দেবী এবং নবদুর্গা ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

জিপে দু'জন পুলিশের মাঝখানে বসে কাশীবাবুর মাথাটা ফের ডোম্বল হয়ে গেল। এতক্ষণ যা দেখলেন, যা শুনলেন, তা কি বিশ্বাসযোগ্য? তাঁর বাবা নসিরাম এবং দাদু শশীরাম কি আসলে তাঁর কেউ নন। তিনি কি কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে? নইলে তাঁর এই ভয়ংকর বিপদের দিনে নসিরাম এবং শশীরাম এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেন কী করে? তিনি যখন ঘোর বিপন্ন, তখন শ্রদ্ধেয় শশীরাম ও শ্রদ্ধেয় নসিরামের এত স্ফুর্তি আসে কী করে? এ তো সেই রাজা নিবোর মতো আচরণ, যখন রোম পুড়ছে তখন নিরো আহ্লাদে তারবাদ্য বাজাচ্ছিলেন। ছিঃ ছিঃ, পূজ্যপাদ শশীরাম ও পূজনীয় নসিরাম সম্পর্কে তাঁর সব পূর্ব ধারণা যে তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ল! এর পরও যদি বেঁচে থাকেন, তবে কাশীরাম হয়তো শশীরামকে 'দাদু এবং নসিরামকে 'বাবা' বলে ডাকবেন, কিন্তু সেই ডাক কি আর অন্তরের অন্তস্তল থেকে উঠে আসবে?

মনের দুঃখে এত অভিভূত হয়েছিলেন কাশীবাবু যে, জিপটা তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে লক্ষই করলেন না। যেখানে খুশি নিক, তাঁর কিছু আসে যায় না। পৃথিবীকে তাঁর চেনা হয়ে গিয়েছে। দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস নেই। এখন পুলিশ তাঁকে ফাঁসিতে লটকালেও তিনি বিশেষ আপত্তি করবেন না। এবং তাঁর এমন সন্দেহও হচ্ছে যে, তাঁর ফাঁসি হয়েছে শুনলে শ্রদ্ধাস্পদ শশীরাম এবং পুণ্যশ্লোক নসিরাম হয়তো বা আনন্দের চোটে হরির লুট দিয়ে বসবেন।

একটা ঘোর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে জিপটা নানা বাঁক নিয়ে, খানাখন্দ পেরিয়ে, ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে একটা দুর্গম জায়গায় এসে থামল। একজন পুলিশ তাঁর হাতকড়া আর দড়ি খুলে দিয়ে হাতজোড় করে বলল, "অপরাধ নেবেন না। আপনার খুড়োমশাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আসুন।"

কাশীরাম আর অবাক হচ্ছেন না। আজ দুপুর থেকে তিনি বারবার এত অবাক হয়েছেন যে, আর অবাক হওয়া সম্ভব নয়। অবাক হওয়ারও তো একটা শেষ আছে রে বাবা! তবে তিনি যত দূর জানেন, তাঁর বড়খুড়ো বাঞ্ছারাম বামুনগাছিতে এবং ছোটখুড়ো হরেরাম হরিদ্বারে থাকেন। এই নীলপুরের জঙ্গলে থাকার মতো বাড়তি খুড়ো তাঁর নেই। তবু

তাতেই বা কী যায়-আসে। নিজের বাপ-দাদাই যদি এমন পর হয়ে যান, তা হলে খুড়ো নিয়ে মাথাব্যথা কীসের?

জিপ থেকে নেমে তিনি চারটে লোকের পিছু পিছু বেশ গটগট করে হেঁটে গিয়ে একটা গোলপাতার ছাউনিওয়ালা ঘরে ঢুকে একজন লম্বা পাঠানি চেহারার লোকের সামনের দাঁড়ালেন।

"আপনার ভাইপোকে এনেছি কর্তা। ইনিই খাঁদু গড়াই।"

পাঠানি লোকটা বলল, "কানের পিছনকার দাগটা দেখে নিয়েছিস তো!"

"যে আজ্ঞে। এই যে।" বলে লোকটা টর্চ ফোকাস করে কাশীবাবুর বাঁ কানের লতিটা উলটে দিয়ে দেখাল। কাশীবাবু আপত্তি করলেন না।

পিছন থেকে কে একজন কাশীবাবুর কোমরে একটা গুঁতো দিয়ে বলল, "পেন্নাম করুন। ইনি আপনার পূজনীয় খুড়োমশাই শ্রীরাখালহরি গড়াই।"

একথায় কাশীবাবু আপত্তিকর কিছুই খুঁজে পেলেন না। দুনিয়ার উপর, জীবনের উপর এমনই আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন যে, এই আখাম্বা লোকটাকে মাসি' বলে ডাকতে হলেও তিনি রাজি। সবাই যখন পর, তখন ডাকে আর কী আসে-যায়। তিনি তাড়াতাড়ি রাখালহরিকে প্রণাম করে ফেললেন।

রাখালহরি বাঘা হাতে তাঁর পিঠ চাপড়ে বলল, "বাঃ, বেশ! বেশ।"

কাশীবাবু বিলক্ষণ জানেন যে, তিনি খাঁদু গড়াই নন এবং এই লোকটা কস্মিনকালেও তাঁর খুড়ো নন। তাঁর দুই খুড়ো হরেরাম ও বাঞ্ছারাম ডাকাবুকো হলেও ডাকাত নন। কিন্তু আজ তাঁর দুনিয়াটাই পালটে গিয়েছে।

রাখালহরি অতি তীক্ষ্ণ এবং সন্ধানী নয়নে কাশীরামকে যেন কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, “নাঃ, এ বড় নধর চেহারা। ঘি-দুধ খাওয়া শরীর, কসরতের কোনও চিহ্নই নেই। ওরে হাবু, কাল থেকেই একে তৈরি করতে লেগে যা বাবা। কয়েক দিনের মধ্যেই বাড়তি চর্বি ঝরিয়ে একটু চাঙা করে দিবি। সনাতন আর গাব্ব একটু প্যাঁচপয়জার শেখাবে। গদাই বন্দুক-পিস্তলের তালিম দেবে। আর কালীকেষ্ট শেখাবে কম্পিউটার। আর শোন, ওর ভাল নাম হল ক্ষুদিরাম, ‘খাঁদু’ বলে কেউ ডাকবি না। ও নামে শুধু আমি ডাকব।”

নীলপুরের জঙ্গলে যখন এই কাণ্ড চলছে, তখন মামুনগড় গাঁয়ে শশীরামের বাড়িতে এক বিরাট কীর্তনের দল এসে হাজির। প্রায় পনেরো-যোলোটা খোল, মেলা করতাল, কাঁসি, ঢোল বাজিয়ে সে একেবারে উদ্দণ্ড তারকব্রহ্ম নাম। বাড়িসন্ধু লোক বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। এমনকী চোখের জল মুছতে মুছতে কমলেকামিনী দেবী এবং নবদুর্গা দেবীও। বাড়ির কাজের লোকজন, আত্মীয় বন্ধু সবাই জুটে গেছেন। এমনকী খাঁদু গড়াইও।

কীর্তনীয়ারা নাচতে নাচতে এক এক করে তাদের চক্রের মধ্যে প্রথমে কাশীরাম, তারপর নসিরাম, তারপর নরহরি থেকে শুরু করে খাঁদু গড়াই পর্যন্ত সবাইকেই টেনে নিল। কীর্তনটা হচ্ছিলও বেশ ভাল। সুরেলা গলা, তালে তালে উদ্দণ্ড নাচ, মাঝে মাঝে উচ্চকিত হরিবোল হরিবোল’ ধ্বনি, মাঝে মাঝে শাঁখ আর উলু—সব মিলিয়ে একেবারে নেশা ধরিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার।

তারপর একসময়ে জয়ধ্বনি দিয়ে কীর্তন স্তিমিত হয়ে শেষ হয়ে গেল। প্রায় টলতে টলতে নসিরাম, শশীরাম, নরহরি আর অন্য পুরুষরা বেরিয়ে এলেন। তারপর কীর্তনের দলটা টপ করে যেন ভভাজবাজির মতো হাওয়া হয়ে গেল। নবদুর্গা দেবী সিধে আর পয়সা দিতে এসে দেখেন, কেউ নেই।

কীর্তনের দলের সঙ্গে খাঁদু গড়াইও যে অদৃশ্য হয়েছে এটা প্রথমে কেউ টের পায়নি। টের পেল রাত্রে খাওয়ার ডাক পড়ার পর। নসিরাম হাঁকডাক করতে লাগলেন, "ওরে, খাঁদু কোথায় গেল দ্যাখ তো! পালাল নাকি?"

নবদুর্গাও চেঁচামেচি করতে লাগলেন, "পালাবে না! দ্যাখো খোঁজ নিয়ে, পোঁটলা বেঁধে সব নিয়ে গিয়েছে কিনা। যেমন তোমার আক্কেল!"

৬. ইদানীং কানাইদারোগা

ইদানীং কানাইদারোগার দিনে বা রাতে মোটেই ঘুম হচ্ছে না। একটু ঝিমুনির মতো এলেও বিকট সব স্বপ্ন দেখে চমকে ওঠেন, চটকা ভেঙে যায়। ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে খিদেও উধাও। মাংস-পোলাওয়ের দিকেও তাকাতে ইচ্ছে করে না, এতই অরুচি। ফলে তাঁর শরীর শুকোতে শুকোতে একেবারে দরকচা মেরে সিকিভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেকার জামা-প্যান্ট সব ঢলঢলে হচ্ছে বলে দরজিকে দিয়ে ছোট করাতে হয়েছে। ঘনঘন জলতেষ্টা আর বাথরুম পাচ্ছে। গত কালই খবর এসেছে যে, সরকার বাহাদুরের তরফ থেকে রাখালহরিকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দিলে দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা কানাইবাবুর পক্ষে কোনও আশার বাণী নয়, বরং আশঙ্কারই কথা। এর অর্থ হল, রাখালহরি যে কতটা ভয়ংকর তা সরকার বাহাদুরও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। পুরস্কারের নোটিশটা থানার নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়ার কথা, তার উপর ঢোল সহরত করে প্রচারের ব্যবস্থা করা। কিন্তু কানাই সাহস করে উঠতে পারেননি। নোটিশ দিলে রাখালহরি পালটা নোটিশ দেবে। যতই ভাবেন ততই মাথা ঝিমঝিম করে। ডাক্তার বলেছে, রক্তচাপ খুব বেশি, উত্তেজনা একদম বারণ।। ||||||||| আগে একজোড়া বেশ পুরুষ্টু গোঁফ ছিল কানাইবাবুর। অনেকটা ঝাঁটার মতো। রোগা হয়ে যাওয়ায় মুখে গোঁফটা মানাচ্ছে না দেখে হেঁটে ছোট করে ফেলেছেন। সকালে থানায় নিজের ঘরে বসে সরু গোঁফে তা দেওয়ার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন তিনি। এমন সময় বিশাল চেহারার

নসিবাবু ভারী হাসি হাসি মুখ করে ঘরে ঢুকে বললেন, "নমস্কার দারোগাবাবু! তা আপনিই এ থানার নতুন দারোগা বুঝি! বেশ বেশ! কানাইদারোগাটা কোনও কাজের ছিল না মশাই! তার আমলেই এ তল্লাটে চুরি-ডাকাতির একেবারে মোচ্ছ। লেগে গিয়েছিল। কী বলব মশাই, আমার ছেলে কাশীরাম তো তিন তিনটে দুর্ধর্ষ ডাকাতি করার পরও দিব্যি গায়ে ফু দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কানাইদারোগা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। এই আপনি এসে তাকে পাকড়াও করলেন। তা তাকে কি সদরে চালান করা হয়েছে নাকি দারোগাবাবু? চালান করাই উচিত। সে অতি বিপজ্জনক লোক।"

কানাইদাবোগা নাক কুঁচকে একটা তাচ্ছিল্যের ফুঃ দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো হাতের ভঙ্গি করে বললেন, "হুঁ, কাশীরাম করবে ডাকাতি! এ যে বানরে সংগীত গায়, শিলা জলে ভাসি যায়, মশাই! যে রাতে বিড়াল ডাকলে ভয় পায়, দু'কেজি মাল টানতে হাঁপিয়ে পড়ে, বিশ কদম হাঁটতে গিয়ে টাল্লা খায়, সে করবে ডাকাতি! তাও একটা-দুটো নয়, তিনটে! সত্যযুগ এসে গেল নাকি মশাই?"

নসিবাবু ভারী অবাক হয়ে বললেন, "আহা, কার ভিতরে কোন প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা কি বাইরে থেকে টপ করে বোঝা যায় ? কিন্তু আপনি নতুন মানুষ, কাশীরাম সম্পর্কে এত কথা জানলেন কী করে?"

কানাইবাবু খ্যাঁক করে উঠে বললেন, "কে বলেছে আমি নতুন মানুষ? আমিই কানাইদারোগা। আপনি চোখের ডাক্তার দেখান।"

নসিরাম হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "ইস, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে তো! ভাল করে দেখে এখন আপনাকে কানাইদারোগা বলেই মনে হচ্ছে যেন! তা এই তত দিন বিশেক হল কাশীরামকে আপনার সেপাইরা গিয়ে ধরে নিয়ে এল! রীতিমতো ওয়ারেন্ট দেখিয়ে। এখন বললেই হল যে তাকে ধরা হয়নি?"

কানাইদারোগা ফুঁসে উঠে বললেন, "আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই যে, কাশীরামকে ধরতে যাব! ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ কানাইদারোগা করে না। আমার এখন পাহাড়-পর্বতের মতো বিরাট বিরাট ডাকাত নিয়ে কারবার। আপনার ওই ননির পুতুল ছেলে কাশীরামকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। বিশ্বাস না হয়, নিজেই গিয়ে লকআপটা দেখে আসুন। দু'জন ছিচকে চোর ছাড়া আর কেউ নেই।"

নসিরাম মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "সর্বনাশ! তা হলে কাশী গেল কোথায়? তাকে লকআপে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়নি তো?"

গম্ভীর হয়ে কানাইদারোগো বললেন, "দেখুন নসিবাবু, পুলিশেরও ঘেন্নাপিত্তি আছে। যে ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় তাকে ধরে এনে পেটানোর মতো আহাম্মক তারা নয়। ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখুন গে, হয়তো বুচিকে বিয়ে করার ভয়ে কোথাও গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে।"

"সর্বনাশ! সর্বনাশ!" বলতে বলতে নসিবাবু তাড়াতাড়ি থানা থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগলেন।

আর ঠিক এই সময় নীলপুরের ভয়াল জঙ্গলের একেবারে ভিতরে একটা ভারী নিরিবিলি জায়গায় কাশীবাবু বিশ ফুট উঁচুতে শূন্যে একটা দড়িতে ঝুল খেয়ে এক গাছ থেকে আর-একটা গাছে যাচ্ছেন। বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই তিনি দড়ি ধরে ঝুলছেন, তেমন কোনও বিকার নেই তাঁর মুখে। বরং একটু যেন হাসি হাসি ভাবই লেগে আছে। এর আগে ভোরবেলা উঠে চাটি ভেজানো ছোলা আর আদা খেয়ে মাইল চারেক দৌড়োত হয়েছে তাঁকে। তারপর দুশো ডন আর দুশো বৈঠক, মুগুর ভাঁজা, যুযুৎসু অনুশীলন এবং কুস্তি করতে হয়েছে তাঁকে। নির্বিকারভাবেই করে গেছেন। প্রথম কয়েক দিন হাঁফ ধরে যেত, গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হত। আজকাল আর ওসব হয় না।।

দড়ি ধরে ঝুল খেয়ে এক গাছ থেকে একশো ফুট দূরের আর এক গাছে গিয়ে উঠতে তাঁর বেশ মজাই লাগছে। বিশ ফুট নীচে উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে তাঁর এই কসরত খুব মন দিয়ে দেখছে রাখালহরি আর তার প্রায় পঞ্চাশজন স্যাঙাত। প্রত্যেকের মুখেই বেশ শ্রদ্ধার ভাব। রাখালের মুখে একটু তৃপ্তির হাসি। স্যাঙাতদের দিকে চেয়ে বলল "ওরে, ওকে আমি ঠিকই চিনেছিলুম। গায়ে আমার রক্তটা তো আছে। যা এলেম দেখাচ্ছে তাতে একদিন আমাকেও ছাড়িয়ে যাবে। কী বলিস তোরা ?"

সবাই একমত হয়ে হর্ষধ্বনি করল। কাশীবাবু একশো ফুট পার হয়ে গাছের ডালে উঠে পড়লেন। তারপর সাবলীল ভঙ্গিতে নেমে মাটিতে পা রাখতেই রাখালহরি এসে তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "শাবাশ, এই তো চাই। মাত্র কুড়ি দিনে তোর যা উন্নতি দেখলাম, অন্যদের এক বছরে হয় না।"

এই সাধুবাদে কাশীবাবুর অবশ্য কোনও ভাবান্তর হল না। আজকাল তিনি খুবই নির্বিকার হয়ে গেছেন। যা বলা হচ্ছে যন্ত্রের মতো তাই করে যাচ্ছেন। রাখালহরি এবার ভারী আদুরে গলায় বলল, "বাবা খাঁদু, এবার যে তোর হাতে-কলমে পরীক্ষা। আজ রাতেই তোর ডাকাতির হাতেখড়ি। আমি ঠাকুরমশাইকে দিয়ে পাঁজি দেখিয়ে রেখেছি। সন্ধের পর একটা জোর মাহেন্দ্রক্ষণ আছে।"

কাশীবাবু বিনয়ের সঙ্গেই বললেন, "যে আজ্ঞে।"

"প্রথম কাজটা সোজাই দিচ্ছি। বিপদের তেমন ভয় নেই। খুনখারাপি বা মারকাট আমি কোনওদিনই পছন্দ করি না। ডাকে হাঁকে-হুমকিতে কাজ হয়ে গেলে রক্তপাত না করাই ভাল। আজ তুই দলবল নিয়ে সন্ধেবেলা বেরিয়ে পড়বি। সোজা মামুনগড় শশীরামের বাড়ি। তোর চেনা বাড়ি, অন্ধিসন্ধি সবই জানা। ভয়ডরের ব্যাপার নেই। শশীবাবুর একটা একনলা বন্দুক আছে বটে, তবে সেটা মরচে ধরে গেছে বলেই খবর। পারবি না?"

কাশীবাবু খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন, "খুব পারব।"

খুশি হওয়ার দুটো কারণ আছে কাশীবাবুর। এক কথা, এত দিন পর বাড়ি যাবেন। দু'নম্বর হল, বাপ-দাদাকে একটা শিক্ষা দিয়ে আসা যাবে। কথাটা ভেবে তিনি বেশ চনমনে বোধ করতে লাগলেন।

রাখালহরি তার দলের দিকে ফিরে বলল, "ওরে তোরা সবাই শোন, মহিষবাথানের জঙ্গল থেকে ছিচকে ডাকাতগুলো আমাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, আমার ভাইপো খাঁদু গড়াই নাকি এখন ওদের কব্জায়, দশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ পেলে ছেড়ে দেবে। সঙ্গে খাঁদু গড়াইয়ের একটা ছবিও পাঠিয়েছে। মর্কটের মতো দেখতে একটা হাড়গিলে চেহারার লোক। দেখে হেসে বাঁচি না। তা আমার টাকা-পয়সার লোভে অনেকেই এখন আমার ভাইপো হতে চাইবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আমি ওদের জানিয়ে দিয়েছি, ওরা যা খুশি করতে পারে, আমি এক পয়সাও দেব না।"

সবাই হর্ষধ্বনি করে উঠল। খবরটা শুনে কাশীবাবুর কোনও হেলদোল হল না। দুপুরে তিনি মাংস দিয়ে প্রচুর ভাত খেয়ে ঘুমোলেন। তারপর বিকেলে উঠে জীবনে প্রথম ডাকাতির জন্য তৈরি হতে লাগলেন।

ঘড়ি ধরে একেবারে মাহেন্দ্রক্ষণে ঠাকুরমশাই এসে মন্ত্রপাঠ করে সকলের কপালে তেল-সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে প্রসাদী জবাফুল মাথায় ঠেকিয়ে শুভযাত্রায় রওনা করিয়ে দিলেন।

জিপ গাড়িতে উঠে ভারী ফুর্তি হচ্ছিল কাশীবাবুর। এই না হলে জীবন! তিনি গুনগুন করে গাইতে লাগলেন, 'হারে-রে-রে-রে-রে– আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে...'তারপর গাইলেন, 'কারার ওই লৌহকপাট, ভেঙে ফ্যাল কর রে লোপাট...'

চোখে একটু আনন্দাশ্রু এসে গিয়েছিল, সেটা মুছে মন্দ্র স্বরে আবৃত্তি করতে লাগলেন, "আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর, কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান, না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ.." তারপর গাইলেন, "উর্ধ্বগগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল..."

মামুনগড়ে তাঁদের বাড়ির সামনে এসে যখন জিপগাড়ি থামল, তখন মোটে রাত আটটা। কমলেকামিনী দেবী ঠাকুরঘরে বসে মালা জপছেন, নবদুর্গা দেবী রান্নাঘরে রাঁধুনিকে তেলকই রান্নার কায়দা শেখাচ্ছেন, নরহরি তার ঘরে বসে সুর করে রামায়ণ পড়ছে, শশীরাম দুধ, খই আর মর্তমান কলা দিয়ে তাঁর নৈশাহার সেরে নিচ্ছেন, আর নসিরাম গাঁয়ের জনাচারেক মাতব্বরের সঙ্গে বাইরের বারান্দায় বসে নিচু স্বরে শলাপরামর্শ করছেন। কাশীরাম যে তিন তিনটে ডাকাতি করেছেন, একথা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারেননি তিনি। কাশীকে যে পুলিশে নিয়ে গেছে একথা শুনেও সবাই মুখ টিপে হেসেছেন, কারও প্রত্যয় হয়নি। তবে কাশীরাম যে নিরুদ্দেশ, এতে সকলেই উদবিগ্ন। কেউ বলছেন কাশী বিয়ের ভয়ে পালিয়েছে, কেউ বলছেন যে সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেছে, কারও ধারণা বাবা আর দাদুর শাসনে অতিষ্ঠ হয়েই সে বিবাগী হয়ে গেছে।

ঠিক এই সময়ে কাশীরাম জিপ থেকে লাফ দিয়ে নামলেন। সঙ্গে আরও দশ-বারোজন বিশালদেহী ডাকাত, সকলেরই মুখে ভুসোকালি মাখা। চেনার জো নেই। কাশীরামের কোমরের দু'দিকে দুটো খাপে-ভরা পিস্তল, হাতে এ কে ফর্টি সেভেন। নেমেই তিনি "রে-রে-রে-রে-রে...," বলে একটা গর্জন ছাড়লেন। গত পনেরো দিন যাবৎ এই গর্জনটা তাঁকে অনেক সাধনা করে শিখতে হয়েছে। ঠিক গর্জন নয়, একে বলে নাদ। নাভিমূল কাঁপিয়ে সেখান থেকে নাদটিকে পেটের ভিতর দিয়ে বুকে তুলে তবে গলা দিয়ে ছাড়তে হয়। এর শব্দে চারদিকে একটা বায়ুকম্প ওঠে। তাতে গাছের শুকনো পাতা সব খসে পড়ে, নেড়ি কুকুরেরা লেজ গুটিয়ে কুঁইকুঁই করে পালায়, গেরস্তদের দাঁতকপাটি লাগে।

নিতান্তই এটা বীরের বাড়ি বলে কারও দাঁতকপাটি লাগল না বটে, কিন্তু স্তম্ভন হল। যেমন কলা সাপটানো দুধ আর খইয়ের মণ্ডটা মুখে চালান করতে গিয়ে শশীরাম ওই অবস্থাতেই ফ্রিজ হয়ে গেলেন, নসিরাম কানাইদারোগার নিন্দে করতে গিয়ে সবে "কা" উচ্চারণ করেছেন, ওই হাঁ আর বন্ধ হল না। রাঁধুনি কই মাছ তেলে ছাড়তে গিয়ে সেই যে কাঠ হয়ে গেল, আর তেলের সঙ্গে মাছের দেখাই হল না। কমলেকামিনী দেবীর মালা টপকানোর আঙুল এমন জট পাকিয়ে গেল যে, মালা তার ঘূর্ণনবেগ হারিয়ে নেতিয়ে ঝুলে

রইল, নবদুর্গা বসা অবস্থা থেকে উঠতে গিয়ে অর্ধেক উঠে সেই যে থেমে গেলেন, আর ওঠাও হল না, বসাও হল না। নরহরি রামায়ণের একটা সর্গ শেষ করে ভারী রামায়ণখানা তুলে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করছিল, সেই প্রণাম আর শেষ হচ্ছিল না। বারান্দায় বসা গাঁয়ের মাতব্বরদের কয়েকজনের মুছার মতো হয়েছিল, আর কয়েকজন বায়ুকম্পে কেতরে পড়ে কাতরাচ্ছিলেন। কাশীবাবু বীরদর্পে বাড়িতে ঢুকে চারদিকের দৃশ্য দেখে ভারী খুশি হলেন। হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে স্যাঙাতদের বললেন, "এইবার লুটপাট শুরু হোক।"

তাঁর স্যাঙাতরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে তাঁকে দেখছিল। তারাও হাঁকার দিয়ে থাকে বটে, কিন্তু তাতে এরকম কাজ হয় না। এ লোকটা এক হাঁকারেই বাড়িসুদ্ধ লোককে স্ট্যাচু বানিয়ে দেওয়ায় তারা ভারী অবাক। "যে আজ্ঞে," বলে তারা কাজ শুরু করে দিল। একমাত্র রাখালহরিই এরকম হাঁকার দিতে পারে।।

শশীরাম শক্ত ধাতের মানুষ। স্তম্ভনটা চট করে কাটিয়ে উঠে তিনি পিটপিট করে চেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "ও নসে, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নাকি?"

নসিরামও সামলে উঠেছেন। বললেন, "হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে! অ্যাই তোরা কারা? ডাকাত নাকি? সিংহের গুহায় ঢুকেছিস ব্যাটারা, সে খেয়াল আছে? ও গিন্নি হাত-দাখানা দাও তো, দেখাচ্ছি মজা।"

শশীরাম তাড়াতাড়ি দুধ-খইয়ের হাত ধুতির খুঁটে মুছে নিয়ে আলমারি খুলতে খুলতে চেঁচাতে লাগলেন, "কই, আমার বন্দুকটা! ব্যাটাদের আজ মুন্ডু উড়িয়ে দেব।"

ফের অট্টহাসি হেসে কাশীরাম বললেন, "নসিবাবু, নারকেলের ছোবড়া কেটে কেটে আপনার হাত-দা কবেই ভোঁতা হয়ে গেছে। আর শশীবাবু, আপনার একনলা বন্দুকে যে মরচে ধরেছে, সে খবর কি আমাদের জানা নেই ভেবেছেন?"

শশীরাম হঠাৎ থতমত খেয়ে বললেন, “ওরে ও নসে, এই ডাকাতের গলাটা যে অবিকল আমার কেশোর মতো!”

নসিবাবুও একটু ঘাবড়ে গেছেন। আমতা আমতা করে বললেন, “হ্যাঁ, গলাটা সেরকমই তো মনে হচ্ছে।”

কাশীরাম পূর্ব অপমানের কথা সামলাতে না পেরে হঠাৎ অত্যন্ত দুঃখের গলায় গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন, “কারও কেউ নই গো আমি, কেউ আমার নয়, কোনও নাম নেই কো আমার শোনো মহাশয়…”।

শশীরাম গান শুনতে শুনতে তালে তালে মাথা নেড়ে ফের চেঁচিয়ে উঠলেন, “ওরে নসে, এ যে আমাদের কাশীই রে! ভুল হওয়ার জো নেই।”

নসিরাম মাথা চুলকে বললেন, “তাই তো? এ তো কাশীই মনে হচ্ছে বাবা!”

“ওরে, আমি তখনই জানতাম, আমার কেশোর মতো ডাকাবুকো ছেলেকে আটকে রাখার মতো জেলখানা এখনও এদেশে তৈরি হয়নি। ওরে, কাশী জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছে! দ্যাখ, দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, কেমন তেজি চেহারা! কেমন টগবগ করছে এনার্জিতে! ওর পুরুষকার জেগে উঠেছে! ও গিন্নি, উলুটুলু দাও! শাঁখটাখ বাজাও ! পাঁচজনে এসে দেখুক…”

কাশীরাম পেল্লায় এক ধমক দিয়ে বললেন, “চোপ! একদম চেঁচামেচি নয়! কাজে কোনওরকম বাধা দিলেই গুলি ছুটবে কিন্তু! নিন, আলমারিটা খুলে ফেলুন, টাকাপয়সা যা আছে বের করে দিন।”

শশীরাম অতি আলগোছের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, “বটেই তো! বটেই তো! কাজের সময় বাজে কথা বলতে নেই। তা এই নে বাপু চাবি, সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে যা দেখে আমি

দু'চোখ সার্থক করি। ওঃ, এত দিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন! আহা, লুটেপুটে নে তো ভাই, আমি দু'চোখ ভরে দেখি!"

কাশীবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "বুড়োদের এই এক বদ স্বভাব। কেবল বকবক করবে। ওরে, তোরা ওঘরে গিয়ে নসিবাবুর বিছানার তোশকটা তুলে দ্যাখ তো!"

নসিবাবু ভারী আপ্যায়িত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ বাবারা, ভাল করে দ্যাখো, আমার তোশকের তলায় বেশ কয়েক হাজার টাকা আছে বটে। এই আনন্দের দিনে কিছু ফেলে যেয়ো না। গুনেগেঁথে নাও গে যাও।"

কাশীবাবু সদর্পে কমলেকামিনী দেবীর ঘরে ঢুকে বললেন, "এই যে দিদিমা, হাতের বালা দুটো চটপট খুলে দিন তো! একদম সময় নষ্ট করবেন না।"

কমলেকামিনী দেবী ডুকরে উঠে বললেন, "ওরে আমার কাশী, ডাকাত হয়েছিস বলে কি সম্পর্ক উলটে দিলি দাদা? কোন আক্কেলে নিজের ঠাকুরমাকে 'দিদিমা বলে ডাকছিস রে মুখপোড়া? কোন সুবাদে আমি দিদিমা হতে গেলুম বল তো হনুমান! এইটুকু বয়স থেকে বুকে করে মানুষ করলুম, মরার আগে তোর মুখে দিদিমা ডাক শুনব বলে? বালাজোড়া চাস, এই নে, খুলে দিচ্ছি, তোর বউকে এই বালা দিয়ে আশীর্বাদ করব বলেই রেখেছিলুম যা, নিয়ে যা। পুলিশের গুঁতো খেয়ে মাথাটাই তোর খারাপ হল কিনা কে জানে!"

কাশীবাবু হতাশায় মাথা নেড়ে আপনমনে বললেন, "ওফ, বুড়োবুড়িদের সঙ্গে আর পারা যায় না।"

রান্নাঘরে হানা দিয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে কাশীবাবু বললেন, "এই যে মাসিমা, গলার হারছড়া খুলে দিন আর গয়নাগাটি কোথায় আছে চটপট বের করুন। আমাদের সময় নেই।"

নবদুর্গা হাঁ করে চেয়ে বললেন, "ও বাবা কাশী, মুখে কালি মেখে কি মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় বাবা আমার! ভাবছিস মাসি ডেকে চোখে ধুলো দিবি। তাই কি হয় রে

বাবা! ডাকাতি করছিস না হয় কর। কিন্তু অত খাটুনি কি তোর সইবে বাবা! শুকিয়ে যে আধখানা হয়ে গেছিস। পিড়ি পেতে বোস তো বাপ, গরম গরম দুটো ভাত খা। তেলকই আছে, পোস্তর বড়া, ধোঁকার ডালনা আর শেষ পাতে পায়েস। গয়নাগাঁটি যা চাস বের করে দিচ্ছি বাবা, শুধু মাথার দিব্যি, দুটি খেয়ে যা!"

কাশীরাম সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, "লৌকিকতার কোনও দরকার নেই। এখন আমাদের কাজের সময়। তাড়াতাড়ি করুন।"

নবদুর্গা তাড়াতাড়ি হার খুলে দিলেন। আঁচল থেকে চাবির গোছা খুলে হাতে দিয়ে বললেন, "আলমারির কোথায় কী আছে সবই তো জানিস বাবা, বের করে নিগে যা। ওরে শোন, ছেলেবেলায় আমাদের গাঁয়ের কালুডাকাতকে দেখেছি, রোজ দু'সের করে মাংস, পাঁচ পো দুধ আর আধসের করে ভেজানো ছোলা খেত।"

বাজে কথা শোনার সময় নেই কাশীরামের। তিনি চটপট শোওয়ার ঘরে গিয়ে গয়নার বাক্স বের করে নিলেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই ডাকাতি শেষ করে সবাই মিলে গিয়ে জিপে উঠে রওনা হয়ে গেলেন।

শশীরাম আহ্লাদে গদগদ হয়ে বললেন, "দেখলি নসে?"

নসিবাবুর মুখও উজ্জ্বল, বললেন, "দেখলুম বই কী?" মাতব্বররাও সব আড়াল-আবডাল থেকে বেরিয়ে এলেন।

উপেনবাবু বললেন, "নসিবাবু, ক্ষমা করবেন। আপনার কথা প্রথমটায় বিশ্বাস করিনি। আমাদের নড়েভোলা কাশী যে জীবনে এত উন্নতি করবে সেটা তো কল্পনাও করিনি মশাই।"

যোগেনবাবু কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "নসিবাবু, একটু দেখবেন। কাশীরামের যা দাপট দেখলাম, আমরা গরিবরা না বেঘোরে পড়ি!"

বিরিঞ্চি পোদ্দার গম্ভীর মুখে বললেন, “না না, এটা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। শত হলেও কাশীরাম যে সমাজবিরোধী হয়ে গেল, এটা মোটেই ভাল হল না।”

খগেন পাল খিচিয়ে উঠে বলে, “রাখুন তো মশাই সমাজবিরোধী! সমাজবিরোধী না হলে এ-যুগে তালেবর হওয়া যায় নাকি? একটা তালেবর লোক খুঁজে বের করুন তো, যে সমাজবিরোধী নয়। এই যে কানাইদারোগা থানায় বসে বসেই রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি ঘুষ খাচ্ছে, সে সমাজবিরোধী নয়? নগদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, মুরগি, মাছ, পাঁঠা, হাঁড়ি-ভরতি রসগোল্লা, বউয়ের জন্য শাড়ি, কী না নিচ্ছে বলুন?”

ফের একটা তর্ক বেধে উঠল এবং সবাই উত্তেজিতভাবে আলোচনায় বসে গেলেন।

ওদিকে নগেন মহিষের বাড়িটা পেরিয়ে যাওয়ার সময় কাশীবাবুর মাথায় চিড়িক করে একটা পুরনো ঘটনা খেলে গেল। অনেক দিন আগে গাঁয়ে বাগদিবাড়ির বউ’ বলে একটা যাত্রাপালা হয়েছিল। কাশীবাবু তখন খুব ছোট, পালিয়ে গিয়ে চুপিচুপি যাত্রার আসরের তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন। নগেন মহিষ তাঁকে ধরে ফেলে এবং টিকিটবাবুদের হাতে তুলে দেয়। টিকিটবাবু আচ্ছাসে কান মলে বের করে দিয়েছিল তাঁকে।

মনে পড়তেই ‘রোখকে, রোখকে’ বলে জিপ থামিয়ে লাফ দিয়ে নামলেন কাশীবাবু, তারপর সেই ‘রে-রে-রে’ গর্জন। চারদিকে ফের বায়ুকম্প, কুকুরেরা কেঁউ কেঁউ, কাকেরা কা কা করতে থাকল, বাড়ির ভিতর নগেন মহিষের মহিষী মূর্ছা গেলেন এবং নগেন মহিষ ডাল মাখা ভাতের গরাস মুখে দিতে গিয়ে নিজের ডান কানে খুঁজে দিলেন।

পদাঘাতে দরজা ভেঙে বীরদর্পে ঘরে ঢুকলেন কাশীরাম। একটা অট্টহাসি হেসে বললেন, “এই যে নগেনবাবু, এবার?”

নগেন মহিষ কাঁপতে কাঁপতে বললেন, “প্রাণে মেরো না বাবা, যা আছে নিয়ে যাও।”

স্যাঙাতরা যথাসাধ্য লুটপাট চালাতে লাগল বটে, কিন্তু হাবু বলল, "ওস্তাদ, ভুল বাড়িতে ঢোকেননি তো! এ লোকটা নিতান্তই ছিচকে দেখছি। দামি জিনিসটিনিস নেই!"

কাশীরাম হুকুম দিলেন, "যা আছে তাই নাও। একে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

হঠাৎ নগেন মহিষও কাশীরামকে চিনতে পারলেন। একগাল হেসে বলে উঠলেন, "ওরে, তুই আমাদের কাশী না? হ্যাঁ কাশীই তো। ওরে তোকে যে কত কোলেপিঠে করেছি, সব ভুলে গেলি!"

কাশীবাবু পেল্লায় এক ধমক মারলেন, "চোপ! গোলমাল করলে খুলি উড়িয়ে দেব।"

"তা তো দিবি বাবা, কিন্তু পুরনো কথা কি সব ভুলে গেলি? সেই যে গুটিগুটি পায়ে এসে বাটি ভরে সত্যনারায়ণের সিন্নি খেয়ে যেতিস, মনে নেই। আর সেই যে সেবার, তোর গ্যাসবেলুনটা হাত ফসকে উড়ে গিয়েছিল বলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছিলি, দেখে আমি তোকে হরগোবিন্দর দোকান থেকে পঞ্চাশ পয়সার লজেঞ্জুস কিনে দিয়েছিলাম, মনে পড়ে?"

কাশীবাবু বুক চিতিয়ে মন্দ্র স্বরে আবৃত্তি করতে লাগলেন, "ক্ষুদিরাম মোর নাম, নিবাস নীলপুর ধাম, খুল্লতাত রাখাল গড়াই, গহীন জঙ্গলে বসে, শীত গ্রীষ্ম বারোমাস, সকলের সর্বস্ব সরাই।"

নগেন মহিষ গদগদ হয়ে বলেন, "ওরে চুরি-ডাকাতি করতে গেলে যে নাম ভাঁড়াতে হয়, তা কি আমি জানি না? যে নামই নিস

কেন বাবা, তুই যে আমাদের আদরের সেই ছোট্ট কাশী তা কি ভুলতে পারি? তুই নসিবাবুর ছেলে, শশীরামের নাতি!"

কাশীবাবু নাটুকে ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললেন, "ওরে, বাপ-দাদা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন, ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা। আছে শুধু কাকা, যেন অমিতাভ বচ্চন, ঊষা-

দিশাহারা-নিবিড় তিমির আঁকা। ওরে ক্ষুদিরাম, ওরে ক্ষুদিরাম মোর। এখনই অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।”

.

ঠিক এই সময় মাইল আষ্টেক দুরে মহিষবাথানের জঙ্গলে মশালের আলোয় একটা মস্ত শিশুগাছের তলায় একটা মিটিং বসেছে। চেয়ারম্যান প্রহ্লাদের হাতে একখানা খোলা চিঠি, তার ভ্রূ কোঁচকানো, মুখ গম্ভীর। সে বলল, “ভাইসব, চিঠির বয়ান পড়ে মনে হচ্ছে রাখালহরি তার ভাইপোর জন্য মুক্তিপণ দিতে রাজি নয়।”

সড়কি সতীশ বলল, “তখনই তো বলেছিলাম দাদা, ওরকম মর্কটের মতো চেহারার একটা হাড়গিলের জন্য দরটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে। দরটা কম করে দিলে খেয়ে যেত।”

লেঠেল ললিত বলল, “আহা, দর তো বেশি দেওয়ারই দস্তুর। পার্টি কষাকষি করলে দর নামানো যেত। কিন্তু এ তো মোটেই দরাদরিই করল না। ফস করে লিখে পাঠাল যে, এক পয়সাও দেব না, যা খুশি কর। খুড়ো হয়ে ভাইপোর উপর এতটা নৃশংস হওয়া কি রাখালহরির ঠিক হল? নাঃ, দিনকাল যা পড়েছে, সম্পর্কের আর দামই নেই।”

গুঁফো গণেশ ভারী হতাশার গলায় বলে, “নাঃ, এত মেহনত জলেই গেল। কেত্তনের দল নিয়ে গিয়ে কত কায়দা করে পাঁকাল মাছ ধরার মতো করে ধরে নিয়ে এলাম, বসিয়ে বসিয়ে কয়েক দিন ভালমন্দ খাওয়ালাম, তার একটা দাম নেই?”।

মারকুটে মহেশ বলল, “কিন্তু পাক্কা খবর ছিল রাখালডাকাত তার লাখো লাখো টাকা আর কয়েক মন সোনা, সেই সঙ্গে দল চালানোর ভার দেওয়ার জন্য হন্যে হয়ে তার ভাইপোকে খুঁজছে। তা আমরা তো সেই ভাইপোকেই খুঁজে দিচ্ছি। ভাইপোর চেয়ে কি টাকাটা বেশি হল? ওরে বাপু, ক’দিন পরে ওই খাঁদুই তো রাখালডাকাতের টাকার পাহাড়ের উপর গ্যাঁট হয়ে বসে হাওয়া খাবে।”

“না, খাবে না।” বলে চাকু চপল উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, “অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের ইনফর্মেশন নেটওয়ার্ক খুব খারাপ। আমি অনেক দিন ধরেই বলছি, আধুনিক টেকনোলজি আর সফিস্টিকেটেড নেটওয়ার্ক ছাড়া এ যুগে আমাদের কাজকর্ম চালানো সম্ভব নয়। মান্ধাতার আমলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার কি এই ইলেকট্রনিকের যুগে চলে?”

প্রহ্লাদ বলল, “আহা, তোমার মোদ্দা কথাটাই ভেঙে বলো না বাপু! নেটওয়ার্কের ডেভেলপমেন্ট করতে তো সময় লাগবে। রাতারাতি তো হবে না। বলি ব্যাপারটা কী?”

চাকু চপল অত্যন্ত ব্যথিত গলায় বলল, “আপনারা একটা ভুল লোককে খাঁদু গড়াই ভেবে ধরে এনেছেন। ও খাঁদু ওরফে ক্ষুদিরাম গড়াই নয়। আসল খাঁদু গড়াই অলরেডি রাখালহরির ছত্রছায়ায় তৈরি হতে শুরু করেছে। সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কথা হল, ট্রেনিং পিরিয়ডে ক্ষুদিরাম গড়াই যে এলেম দেখিয়েছে, তাতে রাখালহরির ধারণা হয়েছে, খাঁদু তাকেও ছাড়িয়ে যাবে।।

সভায় প্রবল গুঞ্জন শুরু হল। সবাই খাড়া হয়ে বসল, কয়েকজন গলা তুলে বলল, “ভেঙে বলো হে! আমরা ডিটেলস শুনতে চাই।”

প্রহ্লাদও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, “বলো কী হে? এরকম ভুল হওয়ার তো কথা নয়! এ-খবর তোমাকে কে দিল হে?”

“আজ্ঞে ঘোড়ার মুখের খবর। আমার মেসোমশাইয়ের মাসতুতো ভাই হল গাব্ব। সে এই বছরখানেক হল জুনিয়র অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে রাখালহরির দলে ঢুকেছে রীতিমতো কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে। হালে সিনিয়র অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে অ্যাকশনে নেমেছে। মাধবপুরের হাটে গত কালই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। চেহারার চেনাই দেখলে হিংসে হয়। ফেডেড জিন্স, ইতালিয়ান টি শার্ট, হাতে দু-দুটো হাইফাই মোবাইল, চোখে গুচ্চি গগল। চেহারা একেবারে ছমছম করছে। কথায় কথায় বলল, ওদের নতুন লিডার এসে

গেছে এবং সে নাকি পুরো সুপারম্যান। প্রথমটায় ভাঙছিল না, পরে স্বীকার করল, লিডার হল রাখালহরির ভাইপো ক্ষুদিরাম গড়াই।"

গুঁফো গণেশ ডুকরে উঠল, "বলিস কী! তা হলে এ কে? এ কি খাঁদু গড়াই নয়?"

চাকু গম্ভীর মুখে বলল, "দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, না, এ খাদু গড়াই নয়। এ জালি মাল।"

সভায় তুমুল শোরগোল উঠল।

প্রহ্লাদ হাঁক দিয়ে বলল, "চুপ, চুপ! সাইলেন্স! খবরটার সত্যতা বিচার না করেই উত্তেজিত হওয়া বিচক্ষণের লক্ষণ নয়। ধরেই নিচ্ছি, চাকু ঠিক কথাই বলেছে, এ-বিষয়ে একটা তদন্ত কমিটি তৈরি হোক। তদন্তের রিপোর্ট দেখে..."

ছিনতাই ছানু কম কথার লোক। এতক্ষণ কথা বলেওনি। এবার সে ব্যাপারের ভিতর থেকে মুন্ডু বের করে বলল, "প্রহ্লাদভায়াকে আর তদন্ত কমিটি করতে হবে না। বরং যাকে ধরে এনেছ তার পেটে গুঁতো দিয়ে কথা বের করে নাও। খামোখা সময় নষ্ট।"

সকলে হর্ষধ্বনি সহযোগে সমর্থন জানাল।

প্রহ্লাদের হুকুমে আটজন সশস্ত্র ডাকাত খাঁদুকে একেবারে ঘিরে ধরে নিয়ে এল প্রহ্লাদের সামনে। এত ভয়ংকর ডাকাতের মাঝখানে থেকেও লোকটার এতটুকু হেলদোল নেই। বেশ নিশ্চিন্ত মনে আছে।

প্রহ্লাদ রোষকষায়িত লোচনে লোকটাকে একেবারে গেঁথে ফেলে হুংকার দিয়ে উঠল, "অ্যাই, তুই কে?"

লোকটা বিগলিত হয়ে বলে, "আজ্ঞে, কেন বলুন তো? আমি তো খাঁদু গড়াই।"

সভা গর্জন করে উঠল, "মিথ্যে কথা!"

খাঁদু সকলের দিকে মিটমিট করে চেয়ে নিপাট ভালমানুষের মতো বলে, "তা আমার খাঁদু নামটা অনেকের পছন্দ নয় বটে। তা পছন্দ না হলে একটা নাম দিয়ে নিলেই তো হয়।"

চাকু বলল, "তুমি একজন ইমপর্টার।"

গুঁফো গণেশ বিচক্ষণ লোক। বলল, "আহা, ওকে একটু বলতে দাও না হে। বাপু খাঁদু, তুমি কি রাখালহরির আপন ভাইপো?"

"যে আজ্ঞে।"

"তিনি তোমার নিজের খুড়ো তো?"

"আজ্ঞে, আগেরটা হলে, পরেরটা তো হতেই হবে। আমি তার আপন ভাইপো হলে, তিনি পরের খুড়ো হন কী করে?"

"কিন্তু তাই যে হচ্ছে হে খাঁদু? তুমি আপন ভাইপো ভাবলে কী হবে? রাখালডাকাত যে পরের খুড়ো হয়ে বসে আছে!"

খাঁদু পিটপিট করে চারদিকে চেয়ে যেন ভারী ঘাবড়ে গেছে, এমন ভাব করে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল, "কথাটার মধ্যে কি একটা প্যাঁচ আছে নাকি মশাই?"

গণেশ মাথা নেড়ে বলে, "না। আমাদের কথায় প্যাঁচ নেই, কিন্তু বাপু, তোমার কথায় আছে। তাই বলছি, প্যাঁচটা একটু খোলল। রাখালহরির, যত দূর জানি, একটার বেশি দুটো ভাইপো নেই। খবর হচ্ছে, তার হাতে এখন একটা ভাইপো মজুত আছে। তা হলে তুমি হিসেবে আসছ কী করে?"

খাঁদু ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলে, "তাই তো মশাই, বড্ড ভাবনায় ফেলে দিলেন!"

"ভাবনার কী আছে হে! আসল কথাটা পকেট থেকে বের করে ঝপাস করে সকলের সামনে ফেলে দাও। তুমি আসলে কে?"

"বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। বিশ্বাস না করারই কথা। তবু যখন চাপাচাপি করছেন, তখন কপাল ঠুকে বলেই ফেলি। আমি আসলে হচ্ছি দয়ালহরি গড়াইয়ের ছেলে ক্ষুদিরাম গড়াই, রাখালহরি গড়াইয়ের ভাইপো। ছেলেবেলায় সবাই 'খাঁদু, খাঁদু বলে ডাকত, সেই থেকে খাঁদু গড়াই।"

গুঁফো গণেশ মৃদু হেসে বলে, "ওই ঢপের চপ তো আমরা একবার খেয়েছি, আর কেন?"

খাঁদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বুঝতে পারছি মশাই, আমাকে আপনাদের মোটেই মনে ধরছে না। ভাবছেন, বেগুনের বদলে ঝিঙে কিনে এনেছেন। যাচাই করে দ্যাখেননি। তাই যদি হবে তা হলে ছেড়ে দেন না কেন, ফেরত যাই।"

মারকুটে মহেশ লাফিয়ে উঠে বলে, "ছেড়ে দেব মানে? তার আগে ছাল ছাড়িয়ে নেব না!"

খাঁদু কুঁকড়ে গিয়ে বলে, "মারধর করবেন না মশাই। মারধর আমার মোটেই সহ্য হয় না। সেবার গিরীনবাবুর বাগান পরিষ্কার করতে গিয়ে একটা আধুলি পেয়ে ট্যাঁকে খুঁজেছিলুম। ন্যায্য পাওনা মশাই। তা সেই দোষে গিরীনবাবু কাঁকালে এমন গুঁতো মেরেছিলেন যে, তিন মাস আমাশায় ভুগে উঠলুম।"

গুঁফো গনশা মিষ্টি হেসে বলল, "এবার একটু কাজের কথায় এলে হয় না? মারধর করারও তো একটা মেহনত আছে বাপু?"

খাঁদু একগাল হেসে বলল, "যে আজ্ঞে, তা আর নেই! ঝুটমুট মেহনত করবেনই বা কেন?"

"মেহনত আমরা মোটেই করতে চাইছি না। আমরা শুধু জানতে চাই, তুমি আসলে কে? কেনই বা রাখালহরির ভাইপো বলে পরিচয় দিয়ে কী মতলবে এখানে এসেছ? আর ঝুটমুট আমাদের হয়রানটাই বা করলে কেন?"

খুব ভাবিত হয়ে খাঁদু এবার তার মাথা চুলকে নিয়ে বলল, "মুশকিলটা হয়েছে কী জানেন? আমার খুড়ো রাখালহরি চার হাত লম্বা, দশাসই চেহারা। আর আমি রোগাভোগা খেকুরে মানুষ। তাই কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না যে, আমি তার ভাইপো। আমি তাই ভাবছি, এবার একদিন কাছারিতে গিয়ে এফিডেবিট করে নামটাই পালটে ফেলব। ভাইপো হয়ে কোনও সুখ নেই মশাই। খুড়ো হলেও

হয় হত। কথায় আছে 'নাল্পে সুখমস্তি, খুড়ৈব সুখম্।' "

গণেশ বলল, "কথা ঘোরাচ্ছ হে। অন্যের কথা ছেড়ে দাও, তোমার খুড়োই তো তোমাকে ভাইপো বলে মানতে চাইছে না। মাত্র দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ চেয়েছিলাম, রাখালডাকাত একটা পয়সাও উপুড় হস্ত করতে রাজি নয়। তার চেয়েও বড় দুঃসংবাদ, তার আসল ভাইপো খাঁদু গড়াই এখন রাখালহরির ডান হাত হয়ে দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে।"

খাঁদু চোখ বড় বড় করে ভারী অবাক হয়ে বলল, "বলেন কী মশাই, মাত্র দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ চেয়েছেন! খুড়োমশাইয়ের যে কোটি কোটি টাকা! ওই জন্যেই তো তার বিশ্বাস হয়নি। ভেবেছেন, এত কম যখন চাইছে তখন নিশ্চয়ই সে আমার আসল ভাইপো নয়। হায়, বড় ভুল করে ফেলেছেন মশাই!"

মহেশ রুখে উঠে বলল, "হ্যাঁ, বড্ড ভুল হয়েছে হে। তবে এবার আর ভুল করছি না। গণেশদাদা, তুমি সরো তো! ভাল কথায় কাজ হওয়ার নয়, অন্য ওষুধ দরকার।"

একথায় সভাস্থলে অন্যরাও 'রে-রে করে উঠল। প্রহ্লাদ আর গণেশ চেষ্টা করেও আটকাতে পারল না। কুড়ি-পঁচিশজন তাগড়াই ডাকাত হাউড়ে এসে পড়ল খাঁদু গড়াইয়ের উপর।

প্রবল ঝটাপটির মধ্যে কিল-চড়-লাথি পড়তে লাগল বৃষ্টির মতো। চারদিকে তুমুল চেঁচামেচি আর গন্ডগোল।

যা কাণ্ড ঘটছিল তাতে খাঁদুর বেঁচে থাকার কথাই নয়। ঝটাপটির ভিতর থেকে প্রথমে টলতে টলতে বেরিয়ে এল মল্লিক, তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। প্রহ্লাদের দিকে চেয়ে কঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "টেকো টগরের কাণ্ডটা দেখলেন! এমন ঘুসো মেরেছে যে, নির্ঘাত নাকের হাড় ভেঙেছে! একটু পরেই ক্যাকাতে ক্যাকাতে লেঠেল ললিত বেরিয়ে মাজা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ে বলল, "কোন বদমাশ যে গোদা পায়ের লাথিটা ঝাড়ল, মাজাটা গেছে।"

দু'মিনিট পরে হাড়ভাঙা হারাধন চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে করুণ গলায় বলতে লাগল, "আমার শখের বাবরি চুল, কোন শয়তান যে ভিড়ের মধ্যে একগোছা উপড়ে নিয়ে গেল। কঁকা ব্রহ্মতালু নিয়ে এখন কোন লজ্জায় লোকালয়ে বেরোই!"

প্রহ্লাদ গম্ভীর হয়ে বলল, "ওরে আর নয়। এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে গেছে। এবার খ্যামা দে বাবারা। লাশটা একটা গর্ত করে পুঁতে ফ্যাল। খুনখারাপি আমার পছন্দ নয়। কিন্তু কী আর করা!"

ঝটাপটি এক সময়ে থামল বটে, কিন্তু অনেক খুঁজেও খাদু গড়াইয়ের লাশটা পাওয়া গেল না।

ওদিকে নীলপুরের জঙ্গলে গভীর রাতে বিজয়গর্বে ফিরে এসেছেন কাশীরাম। মোট পাঁচখানা ডাকাতি করেছেন। স্যাঙাতরা শতমুখে কাশীবাবুর বীরত্বের কথা রাখালহরিকে শোনাচ্ছিল। রাখালহরি তার চেয়ারখানায় জুত করে বসে গোঁফ চোমরাতে চোমরাতে হাসি হাসি মুখ করে শুনছিল। দুলে দুলে বলল, "হবে না! ওসব হল জিনের ব্যাপার। কার রক্ত শরীরে বইছে সেটা দেখতে হবে তো! পরস্পকে নিজস্ব করতে পারাটা একটা

জেনেটিক আর্ট। নাঃ, খাঁদুকে যতই দেখছি ততই ভরসা হচ্ছে। আমার ট্র্যাডিশনটা ধরে রাখতে পারবে। যা বাবা খাঁদু, আজ অনেক মেহনত করেছিস, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়।”

পোলাও-মাংস দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিজের তাবুতে ঢুকে খাটিয়ার বিছানায় কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পেটে শান্তি, মনে প্রশান্তি, চোখে সুষুপ্তি নিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন কাশীরাম।।

শেষ রাতে ভারী ভাল একটা স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। একটা বিশাল রাজবাড়িতে ডাকাতি করতে ঢুকেছেন দলবল নিয়ে। সেপাইসান্ত্রিরা তাঁকে দেখেই অস্ত্রশস্ত্র ফেলে সেলাম জানাল। জরির

পোশাক পরা স্বয়ং রাজা এসে তাকে খাতির করে কোথায় ধনরত্ন আছে তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। এমন সময় মন্ত্রীমশাই এসে তার হাতে সসম্মানে একটা টেলিগ্রাম দিল। কাশীবাবু টেলিগ্রাম খুলে দেখলেন, তাতে বাংলায় লেখা, সরকার বাহাদুর এবার আপনাকে ডাকাতরত্ন’ পুরস্কারে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঠিক এই সময়েই কী করে যেন রাজার তলোয়ারের খাপটা তার বুকে একটা খোঁচা দিল। কাশীরাম ককিয়ে উঠলেন, “এ কী!”

চাপা গলায় কে যেন বলল, “আস্তে! সবাই শুনতে পাবে যে!”

কাশীরাম ধড়মড় করে উঠে বললেন, “কে?”

“ওঃ, তোফা আছেন মশাই! ভাল খাট, বিছানা, বিলিতি কম্বল!”

গলাটা চেনা চেনা ঠেকছে। কাশীরাম উবিগ্ন হয়ে অন্ধকারকেই জিজ্ঞেস করলেন, “খাঁদু নাকি হে?”

"ও নামটা তো শুনলুম আপনি দখল করে বসে আছেন! তা আমাকে পাঁচুটাচু কিছু একটা বলে ডাকলেই হবে। খাঁদু নিয়ে বড় টানাটানি হচ্ছে মশাই।"

কাশীবাবু উদবেগের গলায় বললেন, "তুমি এখানে এসে উদয় হয়েছ কেন বলো তো! মতলবটা কী তোমার?"

খাঁদু অতিশয় আহত গলায় বলল, "দেখুন কাশীবাবু, আমার নাম, আমার খুড়ো সবই বেবাক দখল করে বসে আছেন। তার জন্য কি কিছু বলেছি আপনাকে? লোকের ঘটিবাটি চুরি যায়, টাকা-পয়সা চুরি যায়, সে একরকম। কিন্তু নাম চুরি, খুড়ো চুরি কখনও শুনেছেন? আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! এর পর পুকুর চুরি শুনলেও অবাক হব না। কিন্তু সেসব কথা থাক। আমি তো আর ওসব ফেরত চাইছি না মশাই! "

কাশীরাম এই শীতেও কপালের ঘাম মুছে বললেন, "তবে কী চাও? চটপট বলে সরে পড়ো, নইলে আমি লোক ডাকব।"

খাঁদু অতিশয় দুঃখের গলায় বলে, "তা তো ডাকবেনই। মানুষের কৃতজ্ঞতাবোধ বলেও কী যেন একটা কথা আছে। সেটাও কি বিস্মরণ হল আপনার?"

"কীসের কৃতজ্ঞতা? কী বাবদে কৃতজ্ঞতা?"

"এই যে অমন ভাল নামটা দিয়ে দিলুম, অমন শাঁসালো খুড়োকে পর্যন্ত আপনার হাতে সঁপে দিলুম, সে বাবদে কি কৃতজ্ঞতাটুকুও পাওনা হয় না আমার! তার উপর তোক ডাকবেন বলে শাসাচ্ছেন!"

"ওহে বাপু, আজ বড্ড ধকল গেছে। সোজা কাজ তো নয়, এক রাতে পাঁচ-পাঁচখানা ডাকাতি! তা খাটুনির পর মানুষের তো একটু ঘুমও দরকার হয়, নাকি? অত ভ্যাজর ভ্যাজর না করে আসল কথাটা বলে ফেললেই তো হয়।"

"বলছিলাম কী, বাংলায় একটা কথা আছে, খাচ্ছিল তাঁতি তাত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গোরু কিনে। কথাটা শোনা আছে কি?"

"খুব আছে। ক্লাস সেভেনে বাক্য রচনায় এসেছিল।"

"সেইটেই বলতে আসা।"

"তা বাপু, এটা এমন কী কথা যে, মাঝরাতে একটা হাক্লান্ত লবেজান লোকের ঘুম ভাঙিয়ে বলতে হবে!"

"আপনি তো মাঝরাতে ঘুম ভাঙানোটা দেখছেন। জানেন কি, এ কথাটা আপনাকে বলার জন্য কত বিপদ ঘাড়ে করে, কত মেহনত করে আসতে হয়েছে? খুড়োমশাইয়ের কল কি সোজা? চারদিকে প্রতিটি গাছে মাচান বেঁধে পাহারার বন্দোবস্ত, হুমদো হুমদো সব সেপাইসান্ত্রি ভয়ংকর চেহারার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চারদিকে পায়চারি করছে। মাছিটিও গলতে পারে না।"

"তাও তো বটে! তা হলে তুমি গলে এলে কী করে?"

"আজ্ঞে, সে নিতান্তই ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে।"

"শুধু গলেই আসোনি, এই অন্ধকার জঙ্গলে আমার ভাবুটাও খুঁজে বের করেছ। তার ব্যাখ্যা কী?"

"খুব সোজা। আপনার নাকের ডাক, খেয়াল করলে দেখবেন, সকলের নাক একরকম ডাকে না। কারও বাঘের গর্জন তো কারও শ্যামের বাঁশি, কারও বোমা ফাটার আওয়াজ তো কারও গড়াগড়ার গুডুক গুডুক শব্দ।"

"তা আমারটা কেমন?"

"তবলা লহরা শুনেছেন তো! অনেকটা সেরকম।" কাশীরাম একটা মস্ত হাই তুলে বলেন, "কথা শেষ হয়েছে তো! তা হলে এবার কেটে পড়ো।"

"যে আজ্ঞে। সকালে যখন ঘুম ভাঙবে তখন ঠান্ডা মাথায় কথাটা ভাল করে ভেবে দেখবেন।"

মাইল দশেক দূরে থানায় নিজের চেয়ারে কেতরে বসে কানাইদারোগা হাঁ করে ঘুমোচ্ছিলেন। সদর থেকে হুকুম এসেছে আজ থানায় সবাইকে রাতে তৈরি থাকতে হবে। হঠাৎ চমকে উঠে খাড়া হয়ে বললেন, ঘরে কে একটা ঢুকেছে। মোটা রুলটা তুলে নিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, "কে তুই?"

খাঁদু গড়াই হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বিগলিত হেসে বলে, "দণ্ডবৎ বড়বাবু, এই কাগজখানা দেখাতেই আসা।"

বলে সে একখানা চিরকুটের মতো জিনিস এগিয়ে দিল। সেটা পড়ে কানাইদারোগা বলে উঠল, "বাপ রে! আপনি?"

"ঘাবড়াবার দরকার নেই। সর্বত্র স্প্রে করা আছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনও অসুবিধে হবে না। শুধু গতরখানা নাড়লেই হবে।"

"যে আজ্ঞে।" বলে কানাই শশব্যস্তে বেরিয়ে পড়ল।

খাঁদু গড়াই বাইরে এসে ইদিক-উদিক একটু দেখে নিয়ে অন্ধকারে সুট করে সরে পড়ল।

৭. সকালে ঘুম থেকে উঠে হাই তুলে

সকালে ঘুম থেকে উঠে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে ঝড়াক করে কথাটা মনে পড়ে গেল। খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গোরু কিনে। কাশীবাবু ঠান্ডা মাথায়

ভাবতে লাগলেন, আচ্ছা, শুধু একথাটা বলার জন্য খাঁদু গড়াইয়ের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অত কষ্ট করে মাঝরাতে এসে হানা দেওয়ার কোনও মানে হয় ? জলবতরলং একটা কথা, ঘোরপ্যাঁচ নেই!

তবে কাশীবাবু ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে উঠে বাইরে এলেন। গাছগাছালির ফাক দিয়ে সূর্যোদয় দেখতে দেখতেই ভাবতে লাগলেন। হ্যাঁ, কথাটা হল, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গোরু কিনে। তা কথাটার মধ্যে প্যাঁচটাই বা কোথায়, ধরতাই বা কোথায়! কাশীবাবু প্রাতকৃত্যাদি সারলেন এবং সারতে সারতেও ভাবতে লাগলেন। আচ্ছা জব্বর একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে তো খাদু! মাছির মতো ঘুরে ঘুরে এসে মাথায় বসছে। জ্বালাতন আর কাকে বলে!

ভারী নির্জন বনভূমি। ভারী শান্তি। ভারী আরাম। ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর হঠাৎ কাশীবাবুর চটকা ভাঙল। তাই ততা! এরা সব গেল কোথায়? চারদিকে কোথাও কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো! এত নির্জন, এত শান্ত তো মনে হওয়ার কথা নয়!

কাশীবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে হাবু আর সনাতনের তাঁবুতে উঁকি মারলেন। কেউ নেই। তারপর এ-তবু সে-তাবু, সর্বত্র গিয়ে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখলেন। কোথাও কেউ নেই। এমনকী খুড়োমশাই রাখালহরির ছাউনি পর্যন্ত ফঁাকা। দু'দুটো রাঁধুনি এ-সময়ে গোছ গোছা রুটি বানাতে গলদঘর্ম হয়। দু-দুটো জোগালি তাল তাল আটা মাখতে হিমশিম খায়। কিন্তু তারা কেউ নেই। উনুন নেভানো। গাছে বসে যারা দিনরাত পাহারা দেয়, তাদের কারও টিকিটিও খুঁজে পেলেন না কাশীরাম। তবে কি আজ সকালেই কোথাও বড় ডাকাতিতে বেরিয়ে পড়ল সবাই? তাই বা কী করে হবে! সবাই মিলে একসঙ্গে তো কখনও যাওয়ার নিয়ম নেই। ঠেক তা হলে পাহারা দেবে কে?

কাশীবাবু ভারী তাজ্জব হয়ে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয়, কারও তাবুতে একটাও অস্ত্রশস্ত্র পড়ে নেই। গোটা জায়গাটা হাঁ-হাঁ করছে ফঁাকা।

চোখ কচলে এবং গায়ে চিমটি দিয়ে স্বপ্ন দেখছেন কিনা পরীক্ষা করলেন কাশীবাবু। না, জেগেই আছেন। জেগে থাকার আরও একটা লক্ষণ হল, তার খিদে পাচ্ছে। কিন্তু খাবারদাবারের কোনও জোগাড়ই নেই। ভারী বেকুবের মতো কাশীবাবু এ-তাবু থেকে সে-তবু ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর তার মাথার মধ্যে সেই কথাটা ঘুরে ঘুরে মাছির মতো বসতে লাগল বারবার, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গোরু কিনে।।

খিদে চড়ে গেলে কাশীবাবুর মাথার ঠিক থাকে না। তাই কাশীবাবু ভারী হতাশ হয়ে মাটিতে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন। এমন সময় জঙ্গলের রাস্তায় ঘরঘর শব্দ তুলে একটা জিপগাড়ি এসে দাড়াল। ভারী বিরক্ত মুখে কানাইদারোগা গলা বাড়িয়ে বললেন, "চটপট উঠে আয় তো! হাতে মোটেই সময় নেই। মরছি নিজের জ্বালায়, তার উপর আবার এইসব উটকো ঝামেলা।"

কাশীবাবু দ্বিরুক্তি না করে জিপে উঠে পড়লেন।

কানাই আঁশটে মুখ করে বলেন, "মাথা খারাপ না হলে কেউ দশ মাইল হেঁটে জঙ্গলে মর্নিংওয়াক করতে আসে?"

"মর্নিংওয়াক! কে বলল মর্নিংওয়াক?"

"তাই তো বলল।"

"কে বলল?"

কানাই খিচিয়ে উঠে বলেন, "তোর অত খতেনে দরকার কী? বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা, দিচ্ছি।"

কাশীবাবু আর কথা কইতে সাহস পেলেন না।

বাড়ির ফটকের কাছেই শশীরাম আর নসিরাম দাড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। জিপটা এসে থামতেই কাশীরামকে প্রায় ঠেলে জিপ থেকে নামিয়ে দিয়ে কানাইদারোগা শশীবাবুকে বললেন, "এই নিন আপনার আদরের নাতি।"

শশীবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, "এটা কী হল হে কানাই, তুমি কাশীকে অ্যারেস্ট করলে না যে বড়? আঁ! ব্যাপারটা কী?"

কানাই হাতজোড় করে বললেন, "আমাকে মাপ করবেন শশীবাবু। ওটি পারব না। আমাদের পাঁচ-পাঁচটা থানার লকআপে ঠাসেঠাস ভরতি। চার জনের সেল-এ চল্লিশ জনকে পোরা হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের লিস্টে কাশীরামের নামও নেই।"

"নেই মানে? নেই বললেই হবে? জলজ্যান্ত আমাদের চোখের সামনে ডাকাতি করেছে, আর তুমি বলছ লিস্টে নাম নেই?"

"মশাই, শুধু নিজের কথাই ভাবছেন, একটু পুলিশের কথাও ভাবুন। আপনার মায়া হয় না পুলিশের জন্য? একশো-দেড়শো দাগি ডাকাত নিয়ে আমরা এখন হিমশিম খাচ্ছি, আর আপনি পড়েছেন আপনার নাতি নিয়ে।"

"ওরে বাপু, অ্যারেস্ট হলে যে প্রেস্টিজ বাড়ে। তার উপর ডাকাতির কেস। কী বলিস রে নসে?"

নসিবাবুও কথাটা সমর্থন করলেন। কাণ্ড দেখে কাশীবাবু এতটাই মর্মাহত হলেন যে, এই ঘটনার দিন দুই পর তিনি নিজে উকিল হয়েও একজন বড় উকিলের কাছে গিয়েছিলেন, বাবা আর দাদুকে ডিভোর্স করার কোনও আইন আছে কিনা জানতে। উকিল দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে জানিয়েছিলেন, "না, নেই। ইহজন্মে বাপ-দাদার সঙ্গে সম্পর্ক কোনওক্রমেই নাকি ছাড়ান-কাটান করা সম্ভব নয়। এমনকী মরার পরও তারা পিছু ছাড়েন না। সারাজীবন এঁটুলির মতো লেগে থাকেন।"

তবে হ্যাঁ, কাশীরামের প্রতি শশীবাবু এবং নসিবাবুর আগেকার নাক সিঁটকনোর ভাবটা আর নেই। তারা এখন কাশীরাম কাছে এলে সপ্রশংস চোখে তাকান এবং কাশীবাবু কোনও কথা বললে আগেকার মতো উড়িয়ে না দিয়ে গুরুত্ব সহকারে শোনেন। গাঁয়ের মাতব্বরদের মধ্যেও বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। তারা এখন কাশীবাবুকে দেখলেই শশব্যস্তে ভাল তো বাবা', সব ঠিক আছে তো বাবা', 'কোনও অসুবিধে হলে বোলো বাবা' বলে কুশলপ্রশ্নাদি করে থাকেন। বাজারে গেলে দোকানিরা অন্য খদ্দেরদের উপেক্ষা করে কাশীবাবুকেই আগে জিনিস দেয়। দ্বিজপদ একদিন শশব্যস্তে এসে বলল, "খবর শুনেছেন কাশীদা! আপনার ডাকাতির খবর শতগুণ করে কে বা কারা গিয়ে বিজয়বাবুকে বলে বিয়েটা ভন্ডুল করার উপক্রম করেছিল। বিজয়বাবুও বিয়ে ভাঙার তোড়জোড় করছিলেন। কিন্তু কী কাণ্ড! কুঁচি সাফ বলে দিয়েছে, বিয়ে করতে হলে কাশীরামকেই, আর কাউকে নয়। সামনের শুক্রবার বিজয়বাবু আপনাকে আশীর্বাদ করতে আসছেন।"

দিন পনেরো পরে, এক সকালে কাশীবাবু খুব মন দিয়ে তাঁর বাগানে একটা বিরল প্রজাতির গোলাপ গাছের কলম লাগাচ্ছিলেন।

হঠাৎ নরহরি বলে উঠল, "ওই যে আবার এসেছে! এবার কী বিপদ হয় কে জানে!"

কাশীবাবু অন্যমনস্ক গলায় বললেন, "কে রে?"

"ওই যে দেখুন না?" কাশীবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, ফটকের কাছে খাঁদু গড়াই দাড়িয়ে। তেমনই উলোঝুলো পোশাক, হাড়হাভাতে চেহারা। মুখে গ্যালগ্যালে হাসি, চোখে চোখ পড়তেই ভারী আপ্যায়িত হয়ে বলল, "নাঃ, বাগানখানা বড় সরেস বানিয়েছেন মশাই।"

কাশীবাবু হাত ঝেড়ে উঠে পড়ে বললেন, "এ আপনার ভারী অন্যায় খাঁদুবাবু! না হয় আমাদের মস্ত উপকারই করেছেন, তা বলে নিজের পরিচয়টা আজ অবধি দিলেন না, এটা কি ভাল হচ্ছে?"

খাঁদু গড়াই জিভ কেটে ভারী কাচুমাচু হয়ে বলে, "ওকথা কবেন না। পরিচয়টা পাঁচজনকে বলার মতো নয়। তবে চাপাচাপি যদি করেন, তা হলে চুপিচুপি বলছি মশাই, আমি হলুম গে দয়ালহরি গড়াইয়ের ছেলে, রাখালহরি গড়াইয়ের ভাইপো শ্রীক্ষুদিরাম গড়াই। লোকে খাঁদু বলেই জানে।"

কাশীবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "ওতে আর ভবি ভুলছে না। তা না হয় আসল কথাটা না-ই বললেন। আপনি হয়তো স্পাইডারম্যানই হবেন। কিংবা কে জানে, সুপারম্যানও হতে পারেন। কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা আছে। আজ ছাড়ছি না আপনাকে। সেই যে নীলপুরের জঙ্গলে মাঝরাতে এসে ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গোরু কিনে, সেই ব্যাপারটা আজ আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। কথাটা কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছি মশাই।"

"সে না হয় হবে। কিন্তু সাতসকালে উঠে খালি পেটে সেই বিষ্ণুপুর থেকে তিন মাইল ঠেঙিয়ে আসছি মশাই, মানুষের খিদে-তেষ্টা বলেও তো একটা কথা আছে।"

কাশীবাবু হেসে ফেললেন, বললেন, "ও নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে। ভিতরে আসুন তো, জুত করে বসি।"

তারপর, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গোরু কিনে নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঘোরতর আলোচনা হতে লাগল।

.

তা সে যাই হোক, আসল কথাটা হল, মহিষবাথানের জঙ্গলে আর নীলপুর অরণ্যে আগে অনেক ডাকাত ছিল। এখন আর ডাকাত নেই।